মিয়াজান দারোগার একরারনামা

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড  কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস

১০/১সি মারহাট্টা ডিচ্ লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৩

আলোকচিত্রশিল্পী : প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত



সূচি

প রি শি ষ্ট

আমার মুলুক আর খানদান

আমার জন্ম পুব বাংলার 'ফ' জেলায়। বাপ ছিল চাষা। থাকতাম সদরের কাছেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই ছোট। দেখতে শুনতে ভালো আর চালাক চতুর বলে আমি ছিলাম আম্মির নয়নের মণি। আম্মি বলত আব্বা একটা আস্ত বেওকুফ। দেখাদেখি আমরাও তা-ই মনে করতাম। আমাদের এক সুন্দরী বোনও ছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন তার বয়স হবে বছর চোদ্দো। দু-বছর আগেই আব্বার চেয়েও বয়সে বড় একজনের সঙ্গে তার নিকা হয়। বোনাই ফকির আমাদের জেলার কালেক্টর সাহেবের আর্দালি পিওন। বেশ তালেবর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বোনও আমাদের খুবই হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে। রোজ রোজ ভালো কাপড় পরে আর চাল মেরে বেড়ায়। এর মধ্যে একদিন কালেক্টর হুজুরের বদলির হুকুম এল। দূরে উত্তর-পুবের কোনো একটা জেলায় তিনি চলে গেলেন। আমাদের বুড়ো বোনাইও হুজুরের সঙ্গে চলল, খাস খিদমতগাররা যা হামেশাই করে থাকে। কিন্তু যা হামেশাই ঘটে না তা হল দূরের চাকরিতে সঙ্গে করে বিবিকে নিয়ে যাওয়া। আব্বা সাদাসিধে লোক। মেয়ে অত দূরে চলে যাক সে চায়নি। কিন্তু আম্মি চাইল বোন ফকিরের সঙ্গেই যাক। আমার তখন বয়স কম। জোর করে মেয়েকে দূরে পাঠানোর কারণটা বুঝিনি। বছরখানেক বাদে বোনাই একা শ্বশুরঘরে এল। বোন কেন এল না তার একটা অজুহাত ফকির নিশ্চয়ই দিয়েছিল। আম্মি সেটা শুনে আব্বাকেও যা হোক কিছু বুঝিয়ে দিল। ব্যস, এ নিয়ে ঘরে আর কোনো কথা হল না। এইবার ফকিরের যাওয়ার সময় হলে সে চাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। এতদিনে আমিও নাকি বেশ লায়েক হয়ে উঠেছি। একদিন সকালে ডিঙি চেপে তাই ফকিরের সঙ্গে পাড়ি দিলাম।

পৌঁছে দেখি বোন আমার আরো তুখোড় হয়েছে। গাঁয়ের সেই বোকা মেয়ে এখন কালেক্টর সাহেবের রক্ষিতা। কিছুদিনের মধ্যেই আমিও গেঁয়ো ছোকরা থেকে হুঁশিয়ার চাপরাশি বনে গেলাম। আমার কাজ হল কাছারি চলার সময় সাহেবের হুকুম তামিলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা আর ফাইফরমাস খাটা। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই চার টাকা মাস মাইনের পুরোদস্তুর আর্দালি হলাম। দুনিয়াটা ধীরে ধীরে রঙিন হয়ে উঠছিল। হবে না-ই বা কেন! আমি কিনা এখন খোদ কালেক্টর সাহেবের 'শালা'।

আমার বরাত ফিরল

আমার বোন কালেক্টর সাহেবের পেয়ারের বেগম। সেই সুবাদে চাকরিতে চড়চড় করে উঠছিলাম। হুজুরের সঙ্গে বোনের সম্বন্ধটা গোপন থাকার কথা। আদতে কিন্তু সবাই জানত আর জেনেও না জানার ভান করত। তবে আমাকে খাতির করে চলত সব ধরনের লোকই। পকেটও ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। মাইনে চার টাকা হলে হবে কী, মাসের শেষে রোজগার গড়পড়তা কুড়ি টাকার কম হত না। এবার সারা গায়ে ছোপ ছোপ দাগওয়ালা একটা তেজি টাট্টু কিনলাম। ওটার একটা লাল চারজামা[১] ছিল আর গলায় বাঁধা ছিল ঘুঙুর। টাট্টুটার পিঠে সওয়ার হয়ে ডাঁটে ঘুরে বেড়াতাম। এক কথায় আমার তখন দারুণ রমরমা। এই সময় জেলায় একটা ডাকাতি হল। এলাকার বুড়ো বামুন দারোগা পড়ল মহা ফ্যাসাদে। সে না পারছিল ডাকাতদের হদিস দিতে, না লুঠের মালের কোনো কিনারা করতে। এইবার দেখলাম ফকিরের কেরামতি। সে পথ বাতলে দিল যাতে আমি সুযোগটা কাজে লাগাতে পারি। আদালতের ফন্দিফিকিরে ততদিনে আমিও চোস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু কোনো থানায় ডাকাতি হলে আমার কী ফায়দা তা বোঝার মতো বুদ্ধি তখনও আমার হয়নি। বোনাই তখন যেসব ফন্দিফিকিরে আমাকে তালিম দিয়েছিল, আর তার জবাবে আমি যা যা বলেছিলাম সেগুলো অনেকটা এই রকম:

আমি (মিয়াজান) : তুমি কেন আমাকে এর মধ্যে জড়াতে চাইছ! তুমি কি মনে কর আমি লুঠের মাল হাসিল করতে পারব কিংবা ডাকাতদের গ্রেফতার করতে পারব?

১. গদিযুক্ত জিন, হাওদা

ফকির : জরুর পারবি। শোন, কার্তিক পোদ্দার, যার ঘরে ডাকাতি হয়েছে, সে ব্যাটা যেমন মালদার তেমনি ভিতু। ওর কাছে হদিস আছে কারা ডাকাতি করেছে, আর মালই বা কোথায় গায়েব করে রেখেছে। কিন্তু ও মুখ খুলবে না। ডাকাতদের মুরুব্বি হল ব্যানার্জিরা, কার্তিকেরই তালুকদার। মাল আছে তাদেরই ঘরে। কিন্তু সেসব যেতে দে — ওগুলোর কোনোটাই তোর আমার ব্যাপার না। তুই রামচাঁদ গাঙ্গুলিকে চিনিস তো? প্রতাপ সম্পর্কে ওর ভাই। কিন্তু প্রতাপের উপর রামচাঁদ দারুণ খাপ্পা। তুই যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারিস লুঠের বখরা প্রতাপও পেয়েছে, তাহলেই তোর নসিব খুলে যাবে।

মিয়াজান : কিন্তু সেটা আমি করব কেমন করে?

ফকির : আরে, এটা হল দুনিয়ার সব থেকে সোজা কাজ। কাল সকালে কালেক্টর সাহেব যখন নাস্তার পরে আদালতে বেরোবেন, তুই তখন বারান্দায় হুজুরের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকবি। শুধু বসে থাকলেই চলবে না, সোনাওয়ালার সঙ্গে গুজগুজ করে ডাকাতি নিয়েই সলা করবি। আর এমনভাবে কথা বলবি যাতে সেগুলো হুজুরের কানে পৌঁছোয়। তুই বলবি, 'তাজ্জব বাত! এতদিন কেটে গেল, ডাকাতির একটা কিনারা হল না। দারোগাটা বাজে।' এইরকম আর কী! তারপর বাকি বন্দোবস্ত আমি করব।

মিয়াজান : তারপর কী হবে?

ফকির : আমি কালেক্টরকে খুব ভালোরকম চিনি। বিকেলে কামকাজ খতম হলেই আমাকে তলব করে তোর কথাগুলো যাচাই করবে। আমি তখন বলব, 'আমার বিশ্বাস, তুই পারবি লুঠের মাল হাসিল করতে। তিনি যদি মেহেরবানি করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটা সুপারিশ করেন।' তারপর ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো তোকে

কিছুদিনের জন্য ওই থানার জিম্মাদারি দিয়ে পাঠাবে। আর সেইসঙ্গে এটাও বলে দেবে যে, ডাকাতদের গ্রেফতার করতে পারলে তোর নোকরি পাকা।

মিয়াজান : ঠিক আছে, বুঝলাম। কিছুদিনের জন্য আমাকে দারোগার জিম্মাদারি দেওয়া হল। কিন্তু লুঠের মাল কিংবা ডাকাতদের হদিস আমি কী করে করব! আমার কী পড়া-লেখার কোনো তালিম আছে?

ফকির: তুই তো দস্তখত করতে পারিস। দারোগার পক্ষে ওটাই অনেক। বাকি কাজ রামচাঁদ গাঙ্গুলি সামলে দেবে। এখানকার চাকরি ছেড়ে যাওয়ার আগে তোর দুশো টাকা মিলবে। আরো তিনশো পাবি যদি প্রতাপকে ফাঁসাতে পারিস। তারপর তুই দারোগার চাকরিতে পাকা হয়ে যাবি আর দু-বছরের মধ্যে একেবারে মালামাল।

মিয়াজান: আসল কথাটা বলো, প্রতাপকে কীভাবে ডাকাতির মামলায় জড়াব আর বামালই বা মিলবে কোথায়?

ফকির : তবে শোন— থানায় দাখিল হয়েই তুই একদঙ্গল বরকন্দাজ, চৌকিদার আর গোয়েন্দা নিয়ে কার্তিক পোদ্দারের বাড়ির দিকে রওনা হবি। এতে তোর জরুর একশো টাকা আমদানি হবে। মালদার লোকেদের বাড়িতে ডাকাতির পর দারোগা সওয়াল-জবাব করতে গেলে এটা তার হকের নজরানা। তুই অবশ্যই নজরানা নিবি, তবে নিজের হাতে নয়, বক্সির হাত দিয়ে। বেআদবি যাতে না হয় সেজন্য আধ ঘন্টা অপেক্ষা করবি, গড়গড়া টানবি, তারপর কার্তিককে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসবি। ওকে থানার চৌহদ্দির বাইরে কোনো একটা ঘরে কয়েদ করে রাখতে হবে। সেই ঘরের চালের বাতার

মধ্যে দিয়ে দড়ি ঝুলিয়ে কার্তিকের পিছমোড়া দুটো হাত আচ্ছা করে বাঁধবি। এরপর দড়ি ধরে টান মারলেই ব্যাটার গোটা শরীরের ওজন গিয়ে পড়বে ওর মোচড়ানো দুই কাঁধে। দড়িতে আরো টান দিলে শরীরটা ধীরে ধীরে উপরে উঠবে। তারপর একটা সময় হাতদুটো কাঁধের জোড় থেকে খুলে বেরিয়ে আসবে। এত জবরদস্তির পর কেবল একজনকেই দেখেছি মুখ না খুলতে। কার্তিককে সামান্য একটু টানের বেশি আর কিছু দেওয়ার দরকার পড়বে বলে মালুম হয় না। ওর শরীরটা ভারী, হাতগুলো পলকা, জোড় ছোট ছোট। তার উপর জাতে তামুলি। এইসব লোকেরা বেশি ঝামেলায় যায় না। তুই জরুর এবার আমার খেলটা আন্দাজ করতে পারছিস?

মিয়াজান : বুঝতে তো পারছি! আর এটাও বুঝছি যে কার্তিক এখন আমাদের কব্জায়। বাকি কাজ আন্দাজ করতে কোনো মুশকিল নেই।

ফকির : সাবাস! তুই যে আমিরনের ব্যাটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোর আব্বাটা তো আহাম্মক, কিন্তু তুই পেয়েছিস মায়ের ধারা। কার্তিককে একবার বাগে আনতে পারলেই হল। তখন দেখবি ও কবুল করছে যে, দুজন ডাকাতকে চিনতে পেরেছে — ভোলা সর্দার আর তিলক — বাবু প্রতাপ গাঙ্গুলির খাস শাগরেদ। প্রতাপ যেহেতু দাঙ্গাবাজ আর চরিত্রও ভালো নয়, তাই ও বলবে যে, ওর সন্দেহ লুঠের মাল প্রতাপের ঘরেই পাওয়া যাবে। ব্যস, কেল্লা ফতে! একটা পরোয়ানা নিয়ে তুই প্রতাপের বাড়িতে তল্লাশি চালাবি। বেরিয়ে আসবে লুঠের মাল।

মিয়াজান : কিন্তু কার্তিক মালগুলো শনাক্ত করবে তো?

ফকির : আলবাত করবে। তা না হলে দড়ি, বাঁশ আর এত জোগাড়যন্ত্রের কী দরকার ছিল!

তেজপুর থানার দারোগা হলাম

পরদিন সকাল হতেই আমার বোনাইয়ের পরামর্শ মতো কালেক্টর সাহেবের ঘরের উলটো দিকে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সাহেব তখন নাস্তা করছিলেন। সোনাওয়ালা এলে শুরু হল আমাদের কথাবার্তা।

সোনাওয়ালা : তেজপুর থানার ডাকাতির খবর আর কিছু শুনলে মিয়াজান সাহেব? (কালেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে ইয়ারদোস্তরা আমাকেও খাতির করে সাহেব বলত।)

মিয়াজান : নতুন আর কী শুনব? ওখানকার হালহকিকত তো সবার জানা। ডাকাত কারা তা তো সবাই জানে, জানে না স্রেফ ওই দারোগা।

সোনাওয়ালা : আরে ভাই! দৌলতই হল আসল কথা। দারোগা ব্যাটার তো দু-পয়সা আমদানি হচ্ছে; কেন ফালতু ঝামেলার মধ্যে জড়াবে? ডাকাত ধরলেই তো আমদানির দফারফা! সবাই তো আর তুমি নও। ওই দারোগাটার জায়গায় তুমি বহাল থাকলে কি আর ডাকাতরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত! আসলে সবই বরাত ভাই, সবই বরাত।

মিয়াজান : তা যা বলেছ ভাই! আমি দারোগা হলে তিন দিনের মধ্যে ডাকাতগুলোকে হাত-পা বেঁধে থানায় দাখিল করতাম। কিন্তু আসল কথা হল ম্যাজিস্ট্রেট হুজুরের সঙ্গে তো আমার কোনো চেনাজানা নেই! তিনি কেন আমাকে ডাকাতদের গ্রেফতার করার কাজে বহাল করবেন।

সোনাওয়ালা : কালেক্টর সাহেব যদি একটা খত লিখে দেন তাহলেই তো

> সব কিছুর সুরাহা হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তাতে তাঁর কোনো আপত্তি হবে না। তোমার মন্দ কপাল, তাই এখানে চাপরাশি হয়ে আছ। আসলে তোমার তো দারোগার চাকরি করারই কথা। সবাই সেটা বোঝেও। কালেক্টর সাহেবের পেশকার নিজেই তো গতকাল এই কথা বলছিল। ওর কথার জবাবে একজন অবশ্য বলল, তোমার বয়েসটা এখনও কম। আরে ভাই, তাতে কী? চুল পাকলেই কি আর বুদ্ধি পাকে? বয়েস হলে লোকে সেয়ানা হয় ঠিকই, কিন্তু সে কেবল নিজের আখের গোছাতে। তখন কেবল কুমিরের মতো ঘুষ খায়।

কালেক্টর সাহেব 'কোই হ্যায়' বলে হাঁক পাড়তেই আমাদের কথা থেমে গেল। গাড়ি এসে খাড়া হল দরজায়। সাহেব আদালতে চলে গেলেন। সন্ধেবেলায় নজরে এল, আদালত থেকে ফিরে হুজুর ফুলের বাগিচায় পায়চারি করছেন। চুরুটের বাক্স আর জ্বলন্ত কাঠি হাতে পিছনে পিছনে হুঁশিয়ার ফকির। ওরা নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হুজুর যখন তাঁর খাস চাকর-ফকিরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতেন সেই সময় আর কারো সেখানে যাওয়ার হুকুম ছিল না। আমারও নয়। দূর থেকে আন্দাজ করলাম, আমাকে নিয়েই আলোচনা চলছে। রাত দশটা নাগাদ সাহেব যখন চাঁদের আলোয় কুর্সিতে দোল খেতে খেতে চুরুট ফুঁকছিলেন আমি তখন সেখানে হাজির হলাম। ফকির একটু দূরে সিঁড়ির উপর বসেছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই সাহেব হাঁক দিলেন, 'ফকির, মিয়াজান কাঁহা হ্যায়?' 'হাজির খোদাবন্দ' — আমি গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালাম। 'মিয়াজান, কার্তিক পোদ্দারের বাড়িতে কারা ডাকাতি করেছে তুমি খুঁজে বের করতে পারবে? ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত।' আমি বেশ ওস্তাদের ঢঙে জবাব দিলাম, 'কাজ করার ইচ্ছে থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।' ফকির সুযোগ বুঝে আমাদের কথায় যোগ দিল। শপথ করে বলল, এক হপ্তার মধ্যে যদি আমি

ডাকাতদের খোঁজ দিতে না পারি তাহলে সে নিজের শির কেটে ফেলবে আর জবান কেটে কুত্তা-বিল্লি দিয়ে খাওয়াবে। হুজুর যদি কৃপা করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমায় তেজপুর থানার দারোগার পদে বহাল করার জন্য একটা খত লিখে দেন আর সেই সঙ্গে ভরসা দেন যে ডাকাতদের গ্রেফতার করতে পারলে আমার নোকরি পাক্কা, তাহলেই তিনি দেখতে পাবেন সাত দিনের মধ্যে ডাকাতদের কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় দাখিল করা হচ্ছে। আর পিছনে পিছনে আসছে লুঠের মাল। সাহেব ভাব দেখালেন যেন কতই ধন্দে পড়েছেন। বোনের কাছ থেকে আগেই জানতে পেরেছিলাম আমাকে সুপারিশের চিঠি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হবে। কথা শেষ করে কালেক্টর সাহেব ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তারপর খসখস করে লিখে ফেললেন সেই চিঠি। আমার হাতে লেফাফা বন্ধ চিঠি দিতেই লম্বা একটা সেলাম ঠুকে হাঁটা দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নয়, বোনের ঘরে। এবার ফকিরের সঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঠিক কীভাবে চিঠিটা পেশ করা যায়। আনাড়ি লোক হলে সে ভাববে এইরকম একটা সুপারিশের চিঠি হাসিল করার পর বাকি থাকে কেবল সেটা খাস জায়গায় পেশ করা। আসলে কাজটা মোটেই এত সহজ নয়। চিঠি হাতে পেয়ে দারোগা হওয়ার পথে সব থেকে সহজ বাধাটাই কেবল কাটিয়ে উঠেছি। বরাত ভালো বলতে হবে যে তখনই আহাম্মকের মতো ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে হাজির হইনি। কালেক্টর সাহেবের ওখান থেকে রওনা দেওয়ার একটু পরেই ফকিরও আমার পিছু পিছু বাড়িতে চলে এসেছিল। তারপর আমাদের মধ্যে যে কথা হয় সেটা এইরকম:

মিয়াজান : কী, ফকির মিয়া, আমি কি এখনই চিঠিটা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রওনা হব?

ফকির : সবুর কর বেটা! গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। সব হুজুরেরই কেউ-না-কেউ ফকির আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের ফকির হচ্ছে গোপাল দাস, হুজুরের সর্দার বেয়ারা। প্রথমে গোপালের

সঙ্গে মোলাকাত করে ফয়সালা করতে হবে, যাতে শুরুতেই তোর দরখাস্ত খারিজ হয়ে না যায়। কাল দুপুরে ও যখন খানা পাকাতে ঘরে আসবে তখন আমি একা ওর সঙ্গে দেখা করব। এই উড়েগুলো পয়সার ব্যাপারে ভয়ানক হুঁশিয়ার। ও শালা গাঙ্গুলিবাবুর মালের বখরা আমাদের কাছ থেকে উসুল না করে ছাড়বে না। ম্যাজিস্ট্রেট হুজুরের কাছে কাজ করে ব্যাটা কম-সে-কম বিশ হাজার টাকা কামিয়েছে, তবু দেখ, সেই যখন সাত টাকা মাইনে পেত তখনকার চেয়ে ওর লোভ এখন আরো বেশি।

মিয়াজান : আমার কাছে তো কালেক্টর সাহেবের চিঠি আছে। গোপাল করবেটা কী?

ফকির : এত অস্থির হলে চলে! দুনিয়াদারির কতটা তুই জানিস! তোর তো হালে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, আর আমার বিশ বছর হল সাদা। হুঁঃ! গোপাল কী করবে? তাহলে রামকেষ্ট অধিকারী কেমন করে চার নম্বর অ্যাক্টের কেসে ডিক্রি হাসিল করল? সে তো ছিল গ্রামের ইজারাদার। আদালতের রায় কি একদিনের জন্যও ওর বিরুদ্ধে গেছে? আসল কথাটা হল গোপাল চারশো টাকা পেয়েছিল। ফজল জমিনের জায়গায় তিলক মণ্ডলকে কেন এক বছর ধরে হাজতের ঘানি টানতে হল? স্রেফ বদমাশ ছিল বলে? আসলে রামধন পরামানিক — ওই বাজারের সোনার বেনেটা — ওর বিধবা বোনের সঙ্গে তিলকের সাঁট ছিল। গোপালকে শ-দুয়েক টাকা কবুল করে রামধন বলেছিল যেন সে ম্যাজিস্ট্রেটের কানে তোলে যে, বাজারের চুরিগুলোর পিছনে হাত আছে ওই তিলকের। মওকা মাফিক সোনার বেনে

তিলকের বিরুদ্ধে একটা নালিশ রুজু করে দিল। ব্যস, তৎক্ষণাৎ ওর নামে পরোয়ানা জারি! তাই বলছি, অস্থির হোস না। আগে দারোগার পদে বহাল হয়ে যা, তখন তোর নজরে আসবে কী করে কী হয়। দেখবি, সব কিছু বুঝতে পারছিস।

পরদিন সন্ধেবেলা গেলাম ফকিরের কাছে। দুপুরে ওর গোপালের সঙ্গে ফয়সালা করার কথা। গিয়ে দেখি, ফকির গোপালের উপর দারুণ খাপ্পা হয়ে রয়েছে। বলল, গোপাল হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছে। ফকিরের ধারণা ছিল, তাদের পুরনো দোস্তির খাতিরেই কাজটা হয়ে যাবে। গোপাল সে সবে তো আমল দেয়ইনি, তার ওপর আবার কালেক্টরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে ফকিরকে খুব একচোট খোঁচাও মেরেছে। বলেছে, 'মিয়াজান কি গভর্নর জেনারেলের শালা, যে মুফতে কাজ হয়ে যাবে?' এরপর আর ফকির বসে থাকতে পারেনি। ফিরে এসেছে। দিনে এত ওস্তাদি দেখালেও সেই রাতেই কিন্তু গোপাল তার লোককে আমাদের ঘরে পাঠাল। আসলে ঠান্ডা মাথায় হিসাব কষে সে বুঝেছিল, তদবিরের জোরে তাকে টেক্কা দিয়েই সরাসরি কাজটা আমার হয়ে যেতে পারে। তখন আর তার বরাতে কিছুই জুটবে না। আখেরে গোপালের শাগরেদ বুড়ো মোক্তারের সঙ্গে রফা হল, কাজটা হলে গোপাল একশো টাকা পাবে, তা সে পাকা চাকরি হোক কিংবা ক-দিনের মেয়াদের। আর আমার যে মাস মাইনে, কালেক্টরের দপ্তর থেকে যা আমারই দস্তখত করা রসিদে তোলা হবে, তা যাবে গোপালের ভোগে। আমি প্রথম জানলাম যে, থানার নাকি এটাই দস্তুর। দারোগার মাইনে খায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের খাসবেয়ারা। তার বদলে বিপদে-আপদে দারোগাকে সে রক্ষা করে। আদালতে দারোগার বিরুদ্ধে কোনো মামলা উঠলে যে-কোনো ফিকিরে সে সেটা ডিসমিস করিয়ে দেয়। হয়তো কোনো দারোগার সমন হয়েছে — শুনানি চলার সময় খাস বেয়ারা যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে

থাকে, 'সত্যিই যখন কেউ ঘুষ খায় তখন সবাই চুপ করে থাকে। আর এই দারোগাটা ইমানদার...' বিড়বিড় করে এই কথা বলার সঙ্গে থাকে একটা সমঝদারির হাসি। তাতেই ম্যাজিস্ট্রেট যা বোঝার বুঝে নেন।

গোপালের সঙ্গে ঝামেলাটা ভালোভাবে রফা হয়ে গেলে পরের দিন সুপারিশের চিঠি নিয়ে হাজির হলাম হাকিমের দরবারে। ওখানকার হাল হকিকত দেখে বুঝলাম আগের রাতেই গোপাল হুজুরকে পটিয়ে ফেলেছে। কালেক্টর সাহেবের তদবির করা চিঠিটা হাকিম হুজুরের হাতে দিলে তিনি তা ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট : দারোগা হওয়ার জন্য তোমার বয়েসটা তো খুব কম মনে হচ্ছে।

মিয়াজান : হুজুর যদি হুকুম করেন, আমিও তো বড় হব খোদাবন্দ।

ম্যাজিস্ট্রেট : বয়েস কত হল?

মিয়াজান : পাঁচিশ, খোদাবন্দ। (আসলে কুড়ি বছর হলেও ফকির বলেছিল বাড়িয়ে বলতে)।

ম্যাজিস্ট্রেট : ঠিক হ্যায়। তবে তো অনেক হয়েছে। আমি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলাম তেইশ বছরে। তুমি ডাকাতদের গ্রেফতার করতে পারবে?

মিয়াজান : হুজুর হুকুম করলে আমি বাঘের চোখও উপড়ে আনতে পারি।

ম্যাজিস্ট্রেট : বহুত খুব, এখন যাও, আদালতের সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার চিঠি তৈরি থাকবে।

হুজুরকে একটি মস্ত কুর্নিশ করে তখনকার মতো সরে পড়লাম। চিঠিটা হাতে আসার আগে আরো কিছু খুঁটিনাটি কাজ সামলানোর ছিল। ভবিষ্যতে উন্নতির রাস্তায় যাতে কোনো ঝঞ্ঝাট না আসে তার জন্য পেশকার, সেরেস্তাদার আর ম্যাজিস্ট্রেটের নাজিরকেও কিছু কিছু ঠেকিয়ে খুশি করে রাখলাম। ওরা সবাই জানত আমার মুরুব্বি কারা। তাই চাহিদা খুব বেশি ছিল না। ইচ্ছে

করলেই অল্পস্বল্প দিয়ে কাজ সারতে পারতাম। কিন্তু ফকির আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, আদালতে বাঁচানোর লোক খুব জরুরি। আমার মাইনে গোপালের জন্য বরাদ্দ ছিল। তার থেকে অন্যদের কিছু জুটবে না। তাই একশো টাকা বাকিদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলাম। এরপর রওনা হলাম তেজপুর থানায়, দারোগা-পদের নিয়োগপত্রটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে হাসিল করে আনতে। ডাকাতদের গ্রেফতার, লুঠের মালের কিনারা করতে ব্যর্থতা ও চাকরিতে গাফিলতির অভিযোগে বুড়ো দারোগা ভুবন ব্যানার্জিকে বরখাস্ত করা হল। পরোয়ানা হাতে পেয়েই পরদিন রওনা হলাম তেজপুর। সঙ্গে রইল ফকিরের দোয়া আর দু-জন ভরসা করার মতো শাগরেদ। দারোগার সঙ্গে এইরকম দু-একজন শাগরেদ থাকা খুবই জরুরি। যেখানে দারোগা খোলাখুলি দর কষাকষি করতে পারবে না এদের কাজ সেখানেই। তাছাড়া দারোগার অনুপস্থিতিতে থানার অন্য কর্মচারীদের হালচালের উপর নজরদারি করাটাও এদের কাজ। এইভাবে আটঘাট বেঁধে তৈরি হলাম। সামনে তখন রঙিন জীবনের হাতছানি।

আমার শাগরেদরা ও থানার হালচাল

বাজারের এক বেনের কাছ থেকে তার পালকিটা ধার নিলাম, আমার এক শাগরেদ সওয়ার হল আমারই ছিটছিটে টাট্টুটার উপর, আরেকজন এক বরকন্দাজের আনা মামুলি একটা ঘোড়ায়। পায়ে হেঁটে পিছনে পিছনে চলল একপাল খিদমতগার। হাটবারের দুপুরে তেজপুর থানায় হাজির হলাম। আমার টাট্টুটার সাজ, খিদমতগারদের লাল পাগড়ি, ঝকঝকে ঢাল-তরোয়াল দেখে চারপাশে শোরগোল পড়ে গেল। কানে এল কেউ কেউ বলছে, খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। বরখাস্ত হওয়া বুড়ো দারোগা আগের দিন সন্ধেয় থানা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল কেবল বক্সি আর জমাদার। পালকি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে হাজির করা হল একটা হাতল ভাঙা কুর্সি। চার-পাঁচজন একসঙ্গে লেগে গেল সেটার ধুলো ঝাড়পোঁছ করতে। কুর্সিতে বসে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম সাহেবের নকল করার। সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো যখন হুজুর বলে ডাকল তখন মেজাজ যে কী শরিফ হয়ে গেল কী বলব! হাজার হোক, এই প্রথম কিনা! তাড়াতাড়ি চৌকিদারদের পাঠানো হল দারোগা সাহেবের জন্য দুধ, মুরগি, বকরি, মাছ — যা মেলে জোগাড় করতে। এক ব্যাটা মতলববাজ বুদ্ধি দিল, যা না ওই বোষ্টমিটার ঘরে। ওর নধর বকরিটা নিয়ে আয়। বোষ্টমির সঙ্গে নিশ্চয় ওর আগের কোনো ঝামেলা ছিল। একজন বলল, ও যদি দিতে না চায়? আমারই এক খিদমতগার তেড়িয়া হয়ে হুকুম দিল, যা তো চৌকিদার, দেখি কেমন না দেয়। না করলে বলবি, কোম্পানির হুকুম তামিলের ইচ্ছা আছে না নেই? জো হুকুম বন্দেনায়গি — বলে চৌকিদার চলে গেল। একটু পরেই নজরে এল, একটা সাদা বকরির গলায় কাপড়

পেঁচিয়ে সে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। আর তার পায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে ছুটে আসছে সোমত্ত একটা মেয়ে। আমি এমন ভান করতে লাগলাম যেন কিছুই আমার নজরে পড়েনি। থানার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদার মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিল। অমনি দু-একজন ওর পিছনে পিছনে দৌড়ল যদি এই মওকায় মেয়েটাকে ঘা-কতক লাগানো যায়। হালত সুবিধের নয় বুঝে বোষ্টমি শেষে সরেই পড়ল। বাকি সন্ধেটা কাটল চৌকিদারদের আনাগোনায়। যে যেখান থেকে পেরেছে হাঁস, মুরগি, দুধ জুটিয়ে এনেছে। কেবল মাছটাই জোগাড় হয়নি। বেলা হয়ে যাওয়ায় মাছ ধরার সময় ছিল না। কোম্পানির হুকুম হলে কী হবে, মাঘের সন্ধেয় জেলেদের জলে নামানো যায়নি। ভেট দেখে আমি বেশ খুশি হলাম। তেজপুর থানায় বহাল হওয়ার জন্য যে গুনাগার দিতে হয়েছে তা উসুল করতে হবে তো! তবে ভেট যা এসেছিল তার দাম থাকলেও বকরিটা ছাড়া অন্য কিছুই জমা করে রাখা যাবে না। দু-এক দিনের মধ্যেই সব জিনিস আমার আর ইয়ারবক্সিদের ভোগে যাবে। এই রকম ভেট থেকে তো জেব ভরে না। বেশক বয়স আমার কম, তবে ফকির যেমন বলেছিল, ধাতটা পেয়েছিলাম হুবহু আম্মির। আচমকা ফকিরের আরেকটা পরামর্শ মনে পড়ে গেল। আমি যে লোভী নই তা প্রমাণ করতে হুকুম দিলাম, বকরিটা বাদে বাকি সবকিছু আপসে বাটোয়ারা করে নাও। আমার এই হুকুম জারির সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে কানে আসতে লাগল, হুজুর, বান্দা নওয়াজ আর খোদাবন্দ।

বেলা অনেকটাই গড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে ফালতু লোকেদের ভিড় হাল্কা হতে লাগল। এইবার বসলাম আমার বক্সি আর জমাদারের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত পাকা করতে। বক্সি নব চক্রবর্তী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বামুন। গোঁড়া হিন্দু আর দিব্যি সেয়ানা। দিনের অর্ধেকটা ওর কেটে যায় পুকুরের পাড়ে পুজো করতে, বাকি অর্ধেক যায় খানা পাকাতে, ঘুমোতে আর আড্ডায়। যে-কোনো কাজই ওর কাছে ফ্যাসাদ। মাইনে মাসে আট টাকা, ওর মতে এই

টাকায় ও যা করে তাই যথেষ্ট। চার আনা ঘুষ দিলেও নব চক্রবর্তী না করে না। সেটা পেলেই নিয়মমাফিক রিপোর্ট লিখে দিতে সে হামেশা তৈরি। কিন্তু ওর লেখার অ্যায়সা প্যাঁচ যে দরখাস্তকারীও বুঝতে পারে না যে, বক্সির লেখা রিপোর্ট তার পক্ষে গেল না বিরুদ্ধে। যে যা ডালি দিত তাই নিয়েই সে একটা রিপোর্টের হাতে-লেখা কপি ধরিয়ে দিত। তারপর তাকে বসতে বলে চলে যেত পুজো সারতে। বহু লোকের এমনকি সরকারেরও ধারণা যে, বক্সির কাজ হল মুহুরির মতো থানার তাবৎ মুসাবিদা করা। কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই তা নয়। বক্সিকে বলা যায় দারোগা নম্বর দুই। দারোগা গরহাজির থাকলে বা কোনো তল্লাশিতে গেলে তার কাজ হল দারোগার কুর্সি সামলানো আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট দাখিল করা। দারোগা হাজির থাকলে তাকে অবশ্য কিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় না। তবে রিপোর্ট লেখার কাজটা সবসময়েই বক্সির। নব চক্রবর্তী এই ব্যাপারে খুব খুঁত- খুঁতে ছিল। দারোগা হাজির থাকলে যেহেতু ওর পয়সা খাওয়ার কোনো উপায় থাকত না, তাই সেই রকম সময়ে ও সিধে চলে যেত পুজো করতে কিংবা খানা পাকাতে। ভাবখানা এমন যে দারোগা ঝামেলা সামলাক আর যত পারে ঘুষ খাক। ফরিয়াদিরা চাইত আগের সেই বুড়ো দারোগার সঙ্গে সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলতে। তাদের কাছে সে ছিল একজন ইমানদার লোক। বেশক সে তো যতটা পারে ঘুষ খেত তবে ইমানদার বলে কিছু সাহায্যও করত। নব চক্রবর্তী পারলে দুই তরফের কাছ থেকেই ঘুষ নিত। ব্যাটা এমনই কলমবাজ যে, রিপোর্ট পড়ে কোনো তরফের বোঝার উপায় থাকত না সেটা কার দিকে যাবে। বক্সির এই কেরামতির ব্যাপারে আমলারা, এমনকি খোদ হাকিমও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই ওর দাখিল করা কোনো রিপোর্ট পড়ার আগে খোঁজ নেওয়াটা জরুরি ছিল যে ফরিয়াদির রিপোর্ট সমেত চালান হয়েছে কিনা, কারণ একমাত্র এইভাবেই তাদের মতলব আন্দাজ করা যেত আর বোঝা যেত তাদের ফরিয়াদ ঠিক না ভুল। নব চুপচাপ এইরকম ভালোই পয়সা কামিয়েছিল। ব্যাপারটা জানাজানি হল যখন দুর্গাপুজোর সময় ঘরে

যাওয়ার পথে ওর দু-হাজার টাকা ছিনতাই হয়। নব পনেরো বছর ধরে এই থানায় চাকরি করছে। নিশ্চয় প্রতি বছরই ওই মবলগ ঘরে নিয়ে যেত। এমনিতে নব খুব চুপচাপ, দরকার ছাড়া সে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। কেবল ভাত ফুটে গেলে ওর চাকর রামকে কলাপাতা আনার জন্য হাঁক পাড়তে শোনা যেত।

ছকু ছিল জমাদার। পদমর্যাদায় বক্সির পরেই। একেবারে অন্য মেজাজের লোক। জমাদারের মাইনে ছিল বক্সিরই সমান, মাসে আট টাকা। ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে বক্সির থেকে পিছিয়ে না থাকলেও সে ছিল রীতিমতো গরিব। বয়স বছর চল্লিশ কিন্তু গাঁজার নেশায় শরীর একেবারে বেহাল। ছকুর চেহারাটা ছোটখাটো, কিন্তু চোখ দুটো চকচকে, বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা। গালের চামড়া এতটাই টানটান যে মনে হত হাড়গুলো সেটা ফুটো করে বেরিয়ে পড়বে। সাদা গোঁফটা হামেশাই ওর ঠোঁটের উপর উপর ঝুলে থাকত। ছকুর জীবন শুরু হয়েছিল মুর্শিদাবাদে নবাবের আস্তাবলে ঘেসুড়ে হয়ে। তারপর হয়েছিল সহিস। একে হাল্কা তায় ওস্তাদ সওয়ার হওয়ার সুবাদে এক শিকারি সাহেব ওকে চাবুক সওয়ারের নোকরিতে বহাল করেন। কিছুদিনের মধ্যেই ছকু হয়ে ওঠে তার নতুন মালিকের পেয়ারের লোক। ওর কাজ ছিল শুয়োর শিকারের সময় বর্শা বয়ে নিয়ে যাওয়া আর দরকারমতো সেগুলো হাতের কাছে জোগান দেওয়া। সাহেব যখন লম্বা ছুটিতে ইংল্যান্ড যাবেন বলে ঠিক করলেন তখন তাঁর মাথাতেই আসছিল না এই সওয়ারকে নিয়ে কী করা যায়। ছকুকে যারা চিনত ওকে দিয়ে তাদের কোনো কাজ হত না। ওর কেরামতি বলতে ছিল সওয়ারি করা, গাঁজা টানা আর হায়দার আলি-টিপু সুলতান-ওয়াজিদ আলির গল্পের নামে রাজা-উজির মারা। গুলতানির সময় ও বলত ওয়াজিদ আলি নাকি লম্বায় ছিলেন বুকের কাছ থেকেই আড়াই হাত। আর একবার মওকা পেয়ে পুরো এক পল্টন গোরাকে জবাই করেছিলেন স্রেফ একা হাতে। শিকারি সাহেব যখন দেখলেন ছকুকে চাকরি দিতে কেউ তৈরি নয় তখন তিনি ভাবলেন ওকে থানার জমাদার

পদে বহাল করে দেওয়া যাক। গাঁজাখোর বলে থানার কাজকর্মে আশা করা যায় কোনো ঝামেলা হবে না। সরকারি কর্মচারীর পুরনো সওয়ারকে আট টাকা মাইনে দিতেও হুকুমতের তহবিলে ঘাটতি পড়বে না কিছুই। সাহেবরা ওর জন্য যা করেছে আর করে যাচ্ছে তাতে কারো মনে হতেই পারে যে, ছকু এর জন্য তাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু কোথায় কী! সাহেবদের সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না। গুলতানি করার সময় সাহেবদের কথা উঠলেই সে থু-থু করে বলে উঠত, ওগুলো সব ফিরিঙ্গি কাফের। ছকু বলত কোম্পানির সব হালহকিকত ওর জানা, তারা নাকি বাদশা শাহ্ আলমের দেওয়ান ছিল দিল্লিতে। কেউ প্রমাণের কথা বললে ওর সাফ জবাব ছিল, টাকা আর মোহরের ওপর ছাপের থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? কোম্পানিকে নিয়ে এইসব গল্প যে বেয়াকুবদের কাছেই করা চলে তা ওর ভালোই খেয়াল থাকত। গাঁজা টেনে একবার গল্প শুরু করলে তখন আর ওকে সামলানো যেত না। হাসতে হাসতে আর মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে ছকু বলত, 'কোম্পানি কে তোদের জানা আছে? আসলে কোম্পানি হল একটা বুড়ি আওরত, এত বড় হবে (নিজের ছোট ডান্ডাটা দেখিয়ে), কিন্তু ভাই বড় জালিম, চিন্‌গারির মতো, কোনো নবাব হুকুম তামিল না করলে গভর্নর জেনারেল যখন ওই আওরতকে চিঠি লেখে তখন তার একটাই হুকুম: মারো আর কাটো। গভর্নর জেনারেল ওর নাম শুনলেই ভয় পায়। ওই আওরত হল জানবাজারের রানি রাসমণির মতো।' দরকার হলে ছকু একেবারে পাক্কা শয়তান। সবসময় ওর টাকার দরকার, আর সেটা পেয়ে গেলেই ও সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিত। টাকা করার মতো বুদ্ধি আর প্যাঁচ ওর ছিল না ঠিকই কিন্তু পরে আমি ওর সঙ্গে কাজ করে দেখেছিলাম, ছকু হল কোনো ভালো ফৌজদারের এক নম্বর দোসর। সবথেকে কড়া জুলুম চালানোর সময়ও ওর মুখের হাবভাবে কোনো বদল হত না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটা দেখে যেতে পারত কিংবা সেখানে শুয়েই ঘুমিয়ে নিতে পারত। ভয়ানক অত্যাচার চালানোর পাশাপাশি ওর ঠিক খেয়াল থাকত কতটা টাকা হাসিল

করে নেওয়া যায় আর তার কতটা ভরা যায় নিজের পকেটে। কার্তিক পোদ্দারের মামলাটা আমি ছকুর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম, একটু পরেই সেই কথায় আসছি। ডাকাতি নিয়ে শলাপরামর্শের সময় আমাদের নব চক্রবর্তীকে হিসাবের বাইরে রাখতে হয়েছিল। কারণ ডাকাতদের গ্রেফতার করব বলেই আমাকে বহাল করা হয়েছিল আর তার উপরই নির্ভর করছিল আমার ভবিষ্যতের উন্নতি। জুলুম ছাড়া অন্য কোনো রাস্তার হদিস আমরা করতে পারলাম না। অন্যদিকে জুলুমবাজিতে নবর সায় ছিল না। কার্তিক পোদ্দারকে ফাঁসাতে শয়তানির দরকার পড়লে তাতে আপত্তি ছিল না তার। নিরীহ লোককে ফাঁসানোর জন্য মারপিট করাতেই ছিল ওর আপত্তি। অন্য কোনো কায়দায় কাজটা হাসিল করতে নব ছিল রাজি। নব বলত, ওর মতো লোক, যে প্রত্যেক দিন পুজো করে তবে জল খায়, সে কীভাবে জবরদস্তির মতো পাপ কাজে শামিল হতে পারে! এইজন্য ছকুই হয়ে গেল আমার ডান হাত। টাকা করার সময় যে দড়ি বা মোরানের দরকার তাতে বক্সির মতো ভক্তের কোনো জায়গা নেই। মোরান কথাটা সবার মনে হয় জানা আছে। ইংরেজিতে এরই নাম টুয়্যারনিকেট[১] — শিরা চেপে ধরার যন্ত্র। থানার হালহকিকতের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাদের বিচারে বুড়ো দারোগার থেকে বক্সি ছিল অনেক সৎ। বুড়ো দারোগা খোঁয়াড় থেকেও পয়সা কামাত। বক্সি সম্পর্কে সেইরকম কথা কোনোদিন শোনা যায়নি। জমাদারও যে গোরু-ছাগল বাবদ জরিমানা হাসিল করত সেটা লোকেদের কাছে খুব বড় বজ্জাতি ছিল না, জরিমানা দিয়ে যে পার পাওয়া যেত তা-ই ছিল অনেক। জমাদারের ইচ্ছে হলেই জানোয়ারগুলোকে নিজের ভোগে লাগাতে পারত। কার্তিক পোদ্দারকে ফাঁসানোর জাল থেকে নব চক্রবর্তীকে বাদ দেওয়ার আগে আমি তার কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছিলাম যে নতুন দারোগা থানায় বহাল হলে তাকে কী-কী

১. Tourniquet: শরীরের কোনো অংশে কোনোকিছু শক্ত করে জড়িয়ে বা পেঁচিয়ে ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ সাময়িকভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা বা কৌশল।

রেওয়াজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সবথেকে জরুরি ছিল গ্রামের প্রত্যেক চৌকিদারের কাছ থেকে এক টাকা করে নজর আদায়। নতুন দারোগার সঙ্গে এভাবেই চৌকিদারদের প্রথম মোলাকাত হত। এমনিতে পুরো ব্যাপারটা খুব ফালতু মনে হলেও আসলে ছিল যথেষ্টই লাভজনক। ফকির আগে থেকেই আমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে ওই থানা এলাকায় কতগুলো গ্রাম আছে তার একটা ফিরিস্তি করে দিয়েছিল। এই মোলাকাতের কথা প্রথম থেকেই আমার মাথায় ছিল, তবে এতক্ষণ যে বলিনি তার একটাই কারণ, চৌকিদারদের নজরানার জন্য আমি যে ব্যস্ত তা বুঝতে দিতে চাইনি। এই মোলাকাতের জন্য আমি এতটাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম যে শেষপর্যন্ত ঠিক হল পরের দিনই সেটা হবে। খেয়াল রাখতে হবে তখন একজন দারোগার মাইনে ছিল স্রেফ পঁচিশ টাকা, আর কোনো কোনো থানার এক্তিয়ারে গ্রাম থাকত এক হাজার চারশো। তবে তেজপুরের এক্তিয়ারে ছিল স্রেফ বারোশো। মৌজা প্রতি এক টাকা করে ধরলে আমদানি দাঁড়ায় বারোশো টাকা — সেটা পকেটে ভরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পরের দিন সকালে ওই মজলিশ বসানোর জন্য কিছু জোগাড়যন্ত্রের দরকার ছিল। একটা ঘর ঠিক করা হল যেখানে শতরঞ্চি, তাকিয়া, পানদান, ফরসি[1] সব সাজানো থাকবে। কিছু কিছু গ্রাম বেশ দূরের; তাই চৌকিদারদের আনাগোনা চলবে সারা দিনই, আর আমাকেও ওখানে থাকতে হবে; তাই এত বন্দোবস্ত। চৌকিদারদের জন্য ব্যবস্থা করতে হল পান, সুপারি আর তামাকের। এই রকম মজলিশের দিনে ওদের এইসব দেওয়াটাই রেওয়াজ। সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেলে ওই দিন আমি আসরে হাজির হলাম। হাতে ফরসির নল ধরে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলাম শতরঞ্চির ওপর। পায়ের কাছে বসল আমার দুই শাগরেদ। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পালে পালে চৌকিদারেরা এসে থানায় জমা হতে লাগল। এক এক

১. দীর্ঘ নলযুক্ত তলা চওড়া হুঁকা বিশেষ।

করে তারা আমার সামনে হাজির হয়, তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে একটা করে টাকা পায়ের সামনে রাখে আর আমার শাগরেদদের যে-কোনো একজন ছোঁ মেরে সেটা তুলে নেয়। এই যখন চলছে আমি তখন ফরসি টানতে টানতে এমনভাবে তাকিয়ে থাকছিলাম যেন চৌকিদারেরা আমার সামনে কিছু রাখল কি রাখল না, বা কারা সেটা তুলে নিল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই প্রথম চৌকিদারদের চেহারা ভালো করে দেখার ফুরসত মিলল। বেশির ভাগই ঝুলি ঝুলি জামাকাপড় পরা ডোম, মুচি, চাঁড়াল, হাড়ির মতো নিচু জাতের হিন্দু। এদের মধ্যে মুসলমানগুলো আবার বেশি চৌখশ, আদালতের হালহকিকতে দুরস্ত। দারোগা, গ্রামের জমিদার বা অন্য কারো হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটুও ভড়কে না গিয়ে এরা দিনকে রাত বানাতে ওস্তাদ। অনেকেরই জানা নেই যে, গ্রামবাংলার এই লোকগুলোকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শপথ নেওয়াতে পারলে তাদের দিয়ে সত্যি-মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ানোটা কিছুই নয়। কিন্তু শপথ নেওয়ানোটাই হল কঠিন কাজ। শাস্ত্রে যে এইরকম কোনো নিদান আছে তা-ও নয়, বহু লেখাপড়া জানা বাঙালির কাছে আমি সেকথা শুনেছি। কিন্তু আমি যেমন বলছি বেশির ভাগ সাক্ষীই ওইরকম করে থাকে। এরা মনে করে, মিথ্যা শপথ নেওয়ার পাপ যখন করেই ফেললাম তখন আর ঠেকাচ্ছেটা কে! চৌকিদারের চাকরিতে বহাল হওয়ার এটাও একটা শর্ত। গ্রামের পাটোয়ারি[১] বা তহশিলদারদের জন্যও ওই একই নিয়ম খাটে। যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো সময়ে দারোগা বা তালুকদারের ইশারায় তাদের যা কিছু শপথ নিতে হতে পারে। আর বহালকর্তার খাতিরে সই করতে হতে পারে যে-কোনো জাল জমা ওয়াশিলবাকিতে[২]। তহশিলদার অবশ্য বলবে, 'কী করে অন্য কায়দায় কিছু হবে, স্রেফ সত্যি দিয়ে জমিদারি আগলানো যায় না। সব সম্পত্তির মালিককেই সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে চলতে

১. প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী।

২. খাজনার যে অংশ আদায় হয়েছে ও বাকি আছে তার হিসাব।

হয়, তা নাহলে তারা বাঁচবে কেমন করে? জমিদারের এটা একটা মস্ত দায়। দুনিয়াতে পুরো সত্যি বলে কিছু নেই। তুমিই কি শপথ নিয়ে বলতে পারবে কাল রাতে ঠিক কী-কী খেয়েছ?' যুক্তির এই মারপ্যাঁচ যে আমি খুব একটা তারিফ করতে পেরেছিলাম তা নয়, আমার মনে হয়েছিল শপথ নেওয়ার সময় মিথ্যে হলফ করানো এক জিনিস আর বলতে বলতে কোনো কিছু ভুলে যাওয়া আরেক ব্যাপার। তবে এইসব পরামর্শ যে পুরোপুরি আমার ভাবনার বিরুদ্ধে ছিল তা অবশ্য নয়, কিন্তু আমি এখন চৌকিদারদের গল্পেই ফিরে যাচ্ছি। নতুন দারোগা কাজে বহাল হওয়ার মানেই ছিল চৌকিদারদের দুর্দিন। এইরকম সময়ে বক্সি আর জমাদারদের কিছু না ঠেকানোটাও খুব খারাপ দেখায়, তাই চৌকিদাররা এর জন্য কিছু কিছু দিয়ে দশ টাকার একটা তহবিল তৈরি করত যার নাম 'ভালোমনসাদ'। চলে যাওয়ার আগে এই টাকাটা তারা থানার ছোটবাবুদের হাতে তুলে দিয়ে যেত।

ওই দিন রাতে ঘুমোনোর আগে আমার প্রথম দস্তুরির বারোশো টাকা দেখে মেজাজ খুশ হয়ে উঠল। কিন্তু এর মধ্যে একশো টাকা একেবারে বরবাদ। মওকা বুঝে বেশ কিছু চৌকিদার অচল টাকা ঠেকিয়ে গেছে। যাহোক বাকি এগারোশো নিয়ে কোনো আপশোশ ছিল না। যে দুজন শাগরেদ পুরো দিন আমার খিদমত করেছে তাদের দরাজ হাতে পাঁচ টাকা করে বকশিশ দিলাম। বিছানায় শুয়ে আমি বোনাই ফকিরের জন্য আল্লার কাছে দোয়া চাইলাম। ফকিরের কৃপাতেই তো আজ আমার এত রমরমা। ঘুমের মধ্যে খোয়াব দেখলাম ভিড় করে লোকেরা আমার পায়ের উপর ঝোলা ভরা টাকা ঢেলে দিচ্ছে।

কামকাজ জারি রইল

কেউ যদি ভাবে যে চৌকিদারের নজরই হল নতুন দারোগার একমাত্র আমদানি তাহলে সে খুব ভুল করবে। অবশ্য এটাই ছিল সবথেকে লাভজনক, তবে ঝরঝর করে টাকা না পড়লেও আমদানির কমতি ছিল না। প্রথমে ছিটেফোঁটা মনে হলেও সারা বছরে আমদানি যে খুব খারাপ নয় সেটা দারোগারা পরে বেশ ভালোই বুঝতে পারত। থানার এক্তিয়ারের মধ্যে যেখানে যেখানে নীল চাষ হত আর জমিদারি ছিল, সেখানকার মোক্তারদের সঙ্গে তখনো আমার মোলাকাত হয়নি। এদের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করার ছিল। নীলকরদের রেওয়াজ ছিল বছরে দারোগাকে একটা দস্তুরি দেওয়ার। বছর শেষে ফসল উঠলে তার হিসসা মণপ্রতি স্রেফ চার আনা। ব্যবসার হিসাব কষলে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগবে। এক হাজার মণে দারোগার রোজগার বছরে কেবল দুশো পঞ্চাশ টাকা। রেওয়াজ এটা ছিল ঠিকই, কিন্তু আসল সময়ে দেখা যেত ভাগ অনেক কমে গেছে। আমি খেয়াল করেছি এখান থেকে বছরে আমদানি খুব বেশি হলে হত একশো পঞ্চাশ টাকা। এমন হয়েছে যে স্রেফ পঞ্চাশ টাকাও জুটেছে। জমিদারদের কাছ থেকে পাওনার সময়টা ছিল দুর্গাপুজো, বিশ থেকে একশো টাকার মধ্যে। বছরভর এই আমদানির হিসাব করলে গড়পড়তা হাজার টাকায় দাঁড়িয়ে যায়। এই উপরির শর্ত থাকত একটাই, দারোগা অন্যভাবে আর কিছু চাইতে পারবে না। দারোগার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন এলাকায় হুজ্জত-হাঙ্গামা হলে যারা উপরি দেয় তাকে বা তার লোকদের ফাঁসানো চলবে না। এইসব শর্ত যে খুব একটা জরুরি ছিল তা নয়. আসলে সেরকম জায়গায় দারোগা তল্লাশি করতে হাজিরই হত না। কারণ এক টাকার বেশি খোরাকি ছাড়া আর কিছু পাওয়ার থাকত না তার।

এইসব কাজে তাই বক্সি বা জমাদারকে দায়িত্ব দিয়েই সে খালাস। বন্দোবস্ত দারোগার সঙ্গে বলে এদের বরাতে তখন কিছু জুটত না, তবে একেবারে কিছু না ঠেকালে যদি মামলা ফেঁসে যায় তাই একটা রফা হত কাঁচা টাকায়। হাল এমনই দাঁড়িয়েছিল যে অনেক নীলকর বছরের দস্তুরি দিতে গররাজি হত। তারা আপত্তি করলেও সেসব ধোপে টিকত না এই কারণে যে, এই বন্দোবস্ত অনেক দিন ধরেই চালু। দারোগার পাওনা বাকি রেখে কে কবে বেঁচেছে! তাই শেষপর্যন্ত তাদের দস্তুরি দিতেই হত।

এইসব নিয়ে ভাবার সময় তখন আমার ছিল না। প্রথম কাজটাই ছিল কার্তিক পোদ্দারের বাড়িতে ডাকাতির মামলাটার ফয়সালা। আমি ছকুর পরামর্শমতো একটা ছক তৈরি করে নিলাম কী করে পরের দিন সকাল হলেই একদঙ্গল বল্লাগুস্তি আর বরকন্দাজ নিয়ে তার বাড়িতে চড়াও হব। কার্তিককে কাজে লাগিয়ে প্রতাপকে কী করে ফাঁসাব তার পুরোটা আমি ছকুকে খুলে বলিনি। আমার ইচ্ছে ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, প্রতাপ হল থলেদার আর তার দুই লাঠিয়াল ভোলা আর তিলক ডাকাত। সব শুনে ছকু বলেছিল, 'আমি সব করতে রাজি ভাই, তুমি হুকুম করেই দেখ না, তোমার সামনেই আমি ওর কাঁচা মাংস খাব। ইনসাআল্লা, একবার চলো দেখি।'

ছকুর কথাবার্তা শোনার পর কাজ হাসিল হওয়া নিয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ ছিল না; আমরা রওনা হলাম। কার্তিকের বাড়িটা ছিল অনেকগুলো খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে নিয়ে। বৈঠকখানা থেকে অন্য ঘরগুলো মাটির দেওয়াল আর চাটাই দিয়ে আলাদা করা। বৈঠকখানার চার ধার মাটির দেওয়াল দিয়ে নিচু করে ঘেরা আর মাথার ওপরের চালটা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, বেশ চওড়া আর পুরু করে ছাওয়া। ঘরটা সাজানো ছিল মাদুর, তাকিয়া আর মামুলি চৌকিতে। নজরে এল একপাশে রাখা আছে সর্ষে ভরা মস্ত মস্ত কালো মাটির হাঁড়ি। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বেশ কিছু ধানের গোলাও ছিল। বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে যাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যেই একটা

দরজা। আমরা সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম বৈঠকখানায়, হাতিয়ার সমেত লোকজনে ঘরটা বোঝাই হয়ে গেল। আচমকা এইভাবে হাজির হওয়ায় তাজ্জব হয়ে গেল কার্তিকের পুরো পরিবার। মৌজার চৌকিদারকে পাঠানো হল অন্দরে, যাতে কার্তিক তখনই এসে দেখা করে দারোগার সঙ্গে। এরই মধ্যে আমার খাতিরদারির জন্য এসে পড়ল ফরসি, বরকন্দাজদের জন্য বিছানো হল মাদুর আর ছকুকে আমার কাছেই বসতে দেওয়া হল চৌপাইতে। কার্তিক কেন আমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে তার জন্য ছকু চোটপাট শুরু করে দিয়েছিল। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম ও যাতে মাথা ঠান্ডা রাখে। আমি মনে করে রেখেছিলাম ফকিরের কথা। একশো টাকা না নিয়ে কার্তিক সামনে হাজির হবে না। নিশ্চয় তার বন্দোবস্ত করতেই ওর এতটা সময় লাগছে। এর মধ্যে নজরে এল অন্দরমহলের দরজা দিয়ে কাঁসার থালা হাতে একজন লোক বেরিয়ে আসছে। পরে জেনেছিলাম লোকটা কার্তিকের গোমস্তা। থালাতে ছিল কয়েকটা লেবু, কিছু কিশমিশ, বাদাম, আর একটা টাকা। গলায় সাদা কাপড় জড়ানো এই লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে সেলামের পর সেলাম করতে লাগল। তারপর থালাটা নামিয়ে রাখল পায়ের সামনে।

দারোগা: ঠিক হ্যায়, তোর মালিক কার্তিক কোথায়?

গোমস্তা : ধর্মাবতার, তিনি বাড়িতে নেই, গঙ্গায় নাইতে গেছেন। কর্তা আমার ধার্মিক লোক কিনা, ফুরসত পেলেই গঙ্গায় নাইতে চলে যান।

দারোগা : সেসব তো ভালো কথা, কিন্তু ফিরবে কখন? হাকিম সাহেব তার সঙ্গে মোলাকাত করতে চান। তুই সন্ধের মধ্যে তাকে হাজির করতে পারবি?

গোমস্তা : হুজুর, আপনিই বলুন কেমন করে আপনার গোলাম এই কাজ করবে? কর্তা তো আর পাখি নন যে এক ঘণ্টার ভিতর একশো মাইল উড়ে আসবেন। হুজুরের খানাপিনার সব বন্দোবস্ত করে

দিচ্ছি, (তারপর যে লোকগুলো ওর পিছনে পিছনে উঠোনে এসে জড়ো হয়েছিল তাদের দিকে ফিরে বলল) মধু, ভৈরব, শম্ভু, দাঁড়িয়ে থাকিস না, দুধ নিয়ে আয়, জেলেদের খবর দে, রান্নার বাসন, কাঠ আর জলের জোগাড় দেখ। আর হ্যাঁ, দারোগা সাহেবের লোকেদের জন্য কাছারিটাও খুলে দে, ঘোড়াগুলোকে দানা দিতে ভুলে যাস না আবার।

হুকুম জারি আর সেগুলো তামিল করতে যখন চারধারে শোরগোল পড়ে গেল সেই ফাঁকে গোমস্তার ধান্দা ছিল সরে পড়ার। সেয়ানা ছকু এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছু খেয়াল রাখছিল। এইবার একজন বল্লাগুস্তিকে হাঁক দিয়ে বলল, গোমস্তার দিকে নজর রাখতে। লোকটা চৌকাঠে পা রেখেছে কি রাখেনি বল্লাগুস্তি আচমকা ওর গলায় জড়ানো কাপড়টা ধরে এক টানে হাজির করল ঘরের মধ্যে। এইরকম একটা কাণ্ডের পর গোমস্তা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। ছকুর এবার মনে হল ওর কথা বলার সময় হয়েছে, তাই ও শুরু করল, 'শালা, তুই জানিস আমি কে? দারোগা সাহেব, আপনি কোনো কথা বলবেন না। শালা বলছিল ওর কর্তা গঙ্গায় নাইতে গেছে, তিনি নাকি পাখি নন যে উড়ে আসবেন, কিন্তু আমার এমন কায়দা জানা আছে যে আধ ঘণ্টার ভিতর ওর কর্তাকে আমি এখানে উড়িয়ে আনতে পারি।'

গোমস্তা আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলতে শুরু করল ও যা- যা বলেছে সবই সত্যি। 'দয়া করুন ধর্মাবতার, আমার কর্তা বাড়িতে নেই, আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। জমাদার সাহেব আপনি আমাদের পুরনো হাকিম, আপনি দারোগা সাহেবকে একটু বুঝিয়ে সব কথা বলুন।'

'শালা, আমি নাকি তোর পুরনো হাকিম?' জড়ো হওয়া লোকেদের দিকে ফিরে বেসামাল জমাদার বলতে লাগল, 'তোদের জানা নেই আগের বছর শীতের মরসুমে এই মিয়ার জমিতে বেআইনি গোরু চরানোর মামলায় আমি তল্লাশি করতে এসেছিলাম। শালা আমাকে খানা পাকানোর জন্য শুকনো

কাঠ পর্যন্ত দেয়নি, দিয়েছিল স্রেফ রদ্দি চাল-ডাল আর দুটো কানা বেগুন। কোম্পানির লোকেদের এরা আর খাতির করে না। তোরা খেয়াল রাখিস, এইরকম চলতে থাকলে কোম্পানির হুকুমত আর বেশিদিন নেই। এই যে শালা, তোর কর্তাকে এখনই হাজির কর, না-হলে তোর এই পুরনো হাকিম বাঁশ ডলা দেবে।'

এই সময় একজন আবার বুদ্ধি বাতলালো, গোমস্তা যদি এখনই তার মালিককে হাজির না করে তাহলে তার মাথাটা সর্ষের হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। এইসব কথাবার্তা শোনার পর আরো হয়রান হয়ে গোমস্তা অন্দরমহলে যাওয়ার অনুমতি চাইল। আমি সেটা মঞ্জুর করলে ও চলে গেল ভিতরে। আমার খাসলোকের সঙ্গে এর মধ্যেই গোমস্তার এক শাগরেদের ইশারায় ফন্দি হয়ে গিয়েছিল। আমার সেই লোক বাইরে থেকে ঘুরে এসে চুপিচুপি জানাল যে, গোমস্তা আমাদের ভালোরকম খুশি করতে রাজি। ওর হাতে আমার জন্য পাঠিয়েছে একশো টাকা, জমাদারের দশ আর পাঁচ টাকা দিয়েছে বরকন্দাজদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গোমস্তা হাসিহাসি মুখে ফিরে এল। তার কর্তা নাকি ফিরে এসেছেন। এবার সে বলতে শুরু করল, 'আমি কি আপনাকে মিছে কথা বলতে পারি, কর্তা যখন ঘরে ছিলেন না আমি তখন সে কথাই বলেছি, এখন দেখুন কর্তা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে এত্তেলা করতে ছুটে এসেছি।' একশো মাইল পেরিয়ে কার্তিক পোদ্দারের ঠিক সময়ে হাজির হওয়াটা তাজ্জব ঘটনা, কিন্তু এই দুনিয়াতে তাজ্জব হওয়ার মতো রোজ কত ঘটনাই না ঘটে! যে লোক কোম্পানি বাহাদুরের কর্মচারীদের এইরকম ভালো খাতিরদারি করে তার দু-একটা ছোটখাটো ভুল মাফ করে দেওয়া যায়। ছকু দশ টাকা ওর কোমরবন্ধে ঢুকিয়ে নিয়েছিল, তবে গোমস্তার মাথা সেই সুযোগে হাঁড়ির মধ্যে ভরা হয়নি বলে ওকে গজগজ করতে শুনলাম। ওর মতে, 'ওই শালার জন্য এটা খুব জরুরি ছিল।'

গোমস্তা জানাল সে তার কর্তাকে আনতে যাচ্ছে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে তৈরি হচ্ছেন। প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর নজরে এল অন্দরমহলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছে এক বেঁটেমোটা লোক। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে ওর বাড়িতে চড়াও হয়েছিলাম কার্তিক তা বুঝতে পারেনি। তবে একে বাঙালি তায় মফস্‌সলের আইনকানুনে ঝানু। ও এটা ভালোই বুঝতে পেরেছিল যে দারোগা আর জমাদার যখন পুরো পল্টন নিয়ে হাজির হয়েছে তখন ও কোনোভাবেই রেহাই পাবে না। কার্তিক যে ভুল আন্দাজ করেনি সেটা ধীরে ধীরে বোঝা যাবে। ওর কোনো ভয় নেই, এই বলে ওকে খাড়া হতে বললাম। কিন্তু ও আবার হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে কাঁপতে লাগল। আমি বললাম, হাকিমের কড়া হুকুম হয়েছে ওর বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছে তাদের আর লুঠের মাল খুঁজে বের করতে হবে।

কার্তিক জানাল, তার কিংবা তার পরিবারের কারো জানা নেই যে কারা ডাকাতিটা করেছে আর কোনো ধারণাই নেই সেসব কোথায় লুকোনো থাকতে পারে।

আমি জবাব দিলাম, 'ঠিক হ্যায়, এই মামলার ব্যাপারে আর যা কিছু জানা আছে, সেসব থানায় গিয়ে কবুল করলেই চলবে, এখন যাওয়া যাক।' এই কথা বলার মানে এটা নয় যে, আমরা সেই মুহূর্তে থানার দিকে রওনা হব। এটার অর্থ এই ব্যাপারে যা কিছু বলার তা তো সে এখানে বলেছে, বাকিটা থানায় গিয়ে কবুল করতে হবে। তার উপর আমার মতো একজন ইমানদার লোক কী করে কার্তিকের সঙ্গে জবরদস্তি চালাতে পারে, যে কিনা এত ভালো ব্যবহার করেছে, কিছু না-বলতেই ধরে দিয়েছে একশো টাকা! একজন বেয়াদবের সঙ্গে যা করতাম ওর সঙ্গে তো সেরকম করা চলে না। বেয়াদবদের না আছে কানুনের ওপর না আছে হাকিমের ওপর ভরসা। তাদের খেয়ালে পুলিশের আমলারা হচ্ছে তাদের চাকর, চোর-ডাকাতের

পিছনে দৌড় করিয়েই তাদের বেদম করে ছাড়বে, যেন নিজেরা হলে কিছু না খেয়ে খালি পেটে এইসব করে বেড়াত! 'এখন যাওয়া যাক' মানে তাই সূর্য অস্ত যাবে, চারদিক ঠান্ডা হবে আর আমরা ধীরেসুস্থে যাব। একজন সেয়ানা বরকন্দাজের হাতে কার্তিকের জিম্মাদারি ছেড়ে দেওয়া হল, আর সেইসঙ্গে তাকে হুঁশিয়ার করে দিলাম আমার হুকুম ছাড়া কার্তিক যেন অন্দরে যেতে না পারে। কোনো খারাপ ব্যবহারও যেন তার সঙ্গে না করা হয়। এইরকম জিম্মাদারি মানেই বরকন্দাজের আরো দু-ধার উপরি কামাই। প্রায়শই দারোগার পেয়ারের বরকন্দাজরা এইসব কাজের দায়িত্ব পেয়ে থাকে, এতে তার টাকা দুয়েক রোজগারও হয়। সাধারণত কাজটা হয় এইভাবে : থানায় যাওয়ার আগে আসামি আর বরকন্দাজ গড়িমসি করতে থাকে; প্রথমজনের তাতে কোনো আপত্তি হয় না, কারণ সে ভেবেই নেয় এটা তার সৌভাগ্য যে বরকন্দাজ তাড়াহুড়ো করছে না। কিন্তু বরকন্দাজ জেনেবুঝে এই ফাঁকটা করে, যাতে আসামিকে একলা পাওয়া যায়। তারপর আচমকা তার খেয়াল হয় রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে। খানিকটা দড়ি বের করে এমন ভাব দেখায় যেন রওনা হওয়ার আগে আসামির হাত দুটো বাঁধতে হবে। এইরকম বেইজ্জতির হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা দস্তুরির রেওয়াজ আছে, যা নির্ভর করে আসামির কতটা পয়সার জোর তার উপর। কার্তিকের মামলায় এটা ছিল দু-টাকা। আসামি বড়লোক আর থানা বেশ কিছুটা দূর, যদি সে ঘোড়ায় কিংবা পাল্কিতে যেতে চায়, অবশ্যই টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে। আজেবাজে কোনো বরকন্দাজকে এই কাজের জিম্মাদারি দিলে সে এমন হুজ্জতি শুরু করে যে আমাদের বদনাম হওয়ার জোগাড়। দড়ি বাঁধার দস্তুরিটা হল তার হক, কোনো ইমানদার বরকন্দাজ হলে এই কাজের জন্য অন্য কারো সাহায্য নেবে না। নিমকহারামদের কোম্পানি বাহাদুরের কাজে জায়গা নেই। হাত বাঁধার দস্তুরির কথা এখন এতই চালু যে আজকাল স্রেফ 'যাওয়া যাক' বললেই কয়েদি বরকন্দাজের হাতে সেটা গুঁজে দেয়।

আমরা সন্ধের মধ্যেই থানায় পৌঁছে গেলাম, আরো আধ ঘণ্টা বাদে বরকন্দাজ কার্তিককে এনে হাজির করল। যে দিকটাকে বলা হয় থানার 'চৌকি', ওকে প্রথমে সেখানে রাখার হুকুম দিলাম। এই ফুরসতে আমরা লেগে পড়লাম সবকিছু গোছগাছ করতে। আসল কাজটাই তখনও হয়নি, কার্তিককে দিয়ে এমন কায়দায় একরার করানো, যাতে প্রতাপকে ফাঁসানো যায়।এ৮। যে সহজ কাজ ছিল না তা একটু বাদেই আপনারা জানতে পারবেন। এই কাজটা শেষ করার জন্য আমি খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, কারণ এর উপরই আমার উন্নতি নির্ভর করছিল।

সব বন্দোবস্ত করে আমরা তৈরি হলাম। থানার চৌহদ্দিতে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ছিল, কোনো রসিকের লব্‌জে তারই নাম হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। জামাইয়ের শ্বশুরবাড়ি আসার সঙ্গে যে খাতিরদারির সম্পর্ক এই রসিকতায় সেটাই উল্টো অর্থে বেরিয়ে এসেছিল। আসলে এই ঘরটা ছিল জোরজুলুমের জায়গা। যারা মুখ খুলতে নারাজ, যেসব চোর দোষ কবুল করতে চায় না সেইরকম বেয়াদব লোকেদের এখানে মেরামত করা হত। সমস্ত থানায় এইরকম ঘরগুলোকে শ্বশুরবাড়ি বলে কি না আমার জানা নেই, কিন্তু তেজপুর থানায় ওই নামটাই চালু ছিল। এই নামটা ছিল আমাদের বক্সি নব চক্রবর্তীর দেওয়া। অল্পস্বল্প যে-কটি মশকরা ওকে করতে দেখা গেছে তার মধ্যে এটা একটা।

মাঝরাতে ছকু আর ওর দুই খাসবরকন্দাজ কার্তিককে হাজির করল শ্বশুরঘরে। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারলাম না। আজ সকালেই সে আমার সঙ্গে যেমন ভালো ব্যবহার করেছিল তারপর ওর মুখোমুখি হওয়াটা আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু পুরো ঘটনাটাই চাটাইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখায় আমি বলতে পারি ঠিক কী কী হয়েছিল। এরপর বহুবার জুলুম চালানোর সময় আমি খোদ হাজির থেকেছি কিন্তু সেইসব আর আমার ভালো করে মনে নেই। আমার জীবনে এটাই প্রথম এইরকমের ঘটনা বলে এর প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি মনে করতে পারি। আমার মনে হয় সেসব যেন কালকের ঘটনা।

ওইদিন আমি বুঝেছিলাম ছকু কতটা ভয়ানক। যে দারোগা এই দুনিয়ায় টিকে থাকতে চায় তার ছকু ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমি সেই মুহূর্তে বুঝে গিয়েছিলাম ওকে এরপর থেকে ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে হবে।

কার্তিককে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলে একজন বরকন্দাজ নিখুঁতভাবে সাড়ে তিন হাত জমি মেপে দেগে দিল। কার্তিককে এবার হুকুম করা হল এমনভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে, যাতে ওই দাগগুলো ছুঁতে পারে। একটা জরিপ করার কাঁটা খুলে ধরলে যেমন হবে সেইরকম। শুনে যতটা সহজ মনে হচ্ছে কাজটা করা মোটেই তত সহজ নয়। খুব বেশি হলে কার্তিক লম্বায় হবে পাঁচ ফুট। শরীরের উপরটা লম্বা, পা দুটো ছোট ছোট, পেটটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। মাটিতে দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখেই ভয়ের চোটে ওর তোতলামি শুরু হয়ে গেল। কী করলে এই ভয়ানক কাজের হাতে থেকে রেহাই মিলবে সেটাই ছিল তখন ওর চিন্তা। ছকু বলল, 'তুই কবুল কর প্রতাপ গাঙ্গুলির লোক তিলক আর ভোলা তোর বাড়িতে ডাকাতি করেছে আর প্রতাপের বাড়িতে তল্লাশি করলেই মালের হদিস মিলবে।' এই শুনে কার্তিক একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল, বারেবারে বলতে লাগল এইরকম কিছু কবুল করা মানে প্রতাপ তার পরিবারের সবাইকে খুন করে ফেলবে। 'দয়া করুন জমাদার সাহেব! আপনি তো প্রতাপবাবুকে ভালোই চেনেন। আমার মতো লোক কি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে? পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ডেম্পিয়ার সাহেবকেই তিনি ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন, আমি যদি কিছু বলি তাহলে তো তিনি আমার পুরো পরিবারকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ছাড়বেন।'

ছকু হুকুম করল, 'ঠিক হ্যায়, পা দুটো ওঠা।' কার্তিককে দাগ দেওয়া জায়গার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হল, বরকন্দাজরা চেষ্টা করছিল ওর পা দুটো টেনে দাগের কাছে নিয়ে যাওয়ার। দাগটা ছোঁয়ার দু-হাত বাকি থাকতেই কার্তিকের ঘাম ঝরতে শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছিল ওই চেষ্টা

করতে গেলে শরীরটা চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাবে। শেষে কাঁপতে কাঁপতে ও আচমকা বেহুঁশ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

'ও ঢঙ করছে', বলল ছকু, 'এই বাঙালিগুলো খুব ঢঙ করতে পারে।' তারপর ও একটা ভাঁড় এনে হাজির করল। তার মধ্যে কয়েকটা শুকনো লঙ্কা রেখে ওপর থেকে চাপাল জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। লঙ্কাগুলো পট্‌পট্ করে ফাটতে শুরু করলে এমন ধোঁয়া আর গন্ধ বেরোতে লাগল যে আমরাই হেঁচে-কেশে অস্থির। এবার ছকু সেই ভাঁড়টা নিয়ে গিয়ে রাখল কার্তিকের মাথার কাছে। তারপর ঘরের কোনা থেকে একটা চটের বস্তা তুলে নিয়ে ঢেকে দিল কার্তিকের মাথা আর ভাঁড়টা। অবশ্যই আগে থেকেই বস্তা রাখা ছিল। কার্তিকের বেহুঁশ হয়ে পড়াটা আমার ঢঙ বলে মনে হয়নি; কিন্তু ওই কড়া দাওয়াইয়ের সামনে কিছুই টিকল না। হাঁচতে হাঁচতে আর কাশতে কাশতে তড়াক করে খাড়া হয়ে বস্তাটা ছুঁড়ে ফেলল কার্তিক।

'হা-হা-হা' হেসে উঠল ছকু, 'কী, বলিনি এতক্ষণ ধরে ন্যাকরা করছে? আমি এই বাঙালিগুলোকে খুব ভালোরকম চিনি। এবার নিশ্চয় তোর হুঁশ হয়েছে। আমাদের দিয়ে আর ঝামেলা-হুজ্জত করাস না।'

কার্তিক কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল। ও না পারছিল কথা বলতে, না পারছিল কাঁদতে। জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া ছাড়া ওর মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বের হল না।

'তুই লোকটা বড় বেশি রকমের বজ্জাত। তোর জন্য আমাদের কম ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে! লঙ্কা পোড়াতে গিয়ে আমার আঙুল পুড়েছে, ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় আর তুই বেয়াড়াপনা চালিয়েই যাচ্ছিস?' কার্তিক রা-কাড়তে পারছিল না, পা দুটো নড়বড় করছিল, দেখেই মনে হচ্ছিল বেহুঁশ হয়ে পড়বে। নিশ্চয় ওর শরীরের মধ্যে কোনো গড়বড় হয়েছিল। কিন্তু ছকু তখন খেপে উঠেছে। লঙ্কার ধোঁয়ায় হাঁচি-কাশি ওর কম হয়নি। তাই ও এবার ঘরের চাল থেকে দড়ি ঝোলানোর শেষ হুকুম জারি করল,

তারপর নিজেই পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল কার্তিকের হাতদুটো। হাত বাঁধার সময় কার্তিক কোনো আপত্তি করল না। ওর সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে সেটা ও তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু চাল থেকে ঝোলানো দড়িটার দিকে নজর পড়তেই ওর কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ও শুরু করে দিল চিৎকার। ছকুর ঘাড়ে তখন শয়তান ভর করেছে। দড়ির শেষ গিঁটটা নিজের হাতে ভালো করে দিয়ে যে বরকন্দাজ সেটার অন্য দিক ধরে দাঁড়িয়েছিল তাকে সরিয়ে নিজেই পাগলের মতো টান দিল। আমি শুধু শুনতে পেলাম একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। টিমটিমে বাতির আলোয় নজরে এল উপর থেকে কিছু একটা ঝুলে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতিটা নিভে গেল। চারদিক অন্ধকার। কী হল দেখার জন্য ওই ঘরের দিকে পা বাড়াতেই দেখি ছকু কাশতে কাশতে আর থুঃ থুঃ করতে করতে বেরিয়ে আসছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ছকু মিয়া, ক্যায়া হাল?'

ছকু জবাব দিল, 'লোকটা ভয়ানক বজ্জাত, এইরকম জিনিস আগে কখনও আমার নজরে পড়েনি। বাতিটা নিভে গেছে। আর একটা নিয়ে আসি আর দিয়ে আসি একটা টান। এক ছিলিম না হলে আর চলছে না। ওই বজ্জাতটার জন্য লঙ্কার ধোঁয়ায় আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

আমার মনে হল না ছকু লঙ্কার ব্যাপারটা কার্তিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ঠিক করছে, কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। বাতি জ্বালানো হলে যে বরকন্দাজ সেটা রাখতে গিয়েছিল সে ফিরে এসে আমাকে জানাল, মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর কার্তিক আর নড়াচড়া করেনি, একই জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম ছকুর কাছে। ও তখন থানার দরজার সামনে বসে গাঁজা টানছিল।

সব শুনে ও জবাব দিল, 'শালা আবার ঢঙ শুরু করেছে, একটু সবুর করুক আমি গিয়ে ওর ব্যবস্থা করছি।'

এই বলে আমার সঙ্গে ও ঘরের দিকে চলল। তারপর আমাকে দরজার

কাছে রেখে ছকু গিয়ে দাঁড়াল মাটিতে পড়ে থাকা কার্তিকের সামনে। দারুণ জোরে লাথি কষানোর পরেও যখন কার্তিক আর নড়াচড়া করল না, তখন একজন বরকন্দাজ বাতিটা ওর মুখের সামনে ধরে বলে উঠল, 'মরে গেছে।'

এটা শোনার পর ছকু ওর হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে জানাল, এবার আর ঢঙ নয়, কার্তিক ব্যাটা মরেছে শেখ ফরিদের মতোই।

ছকু যে দয়ামায়াহীন লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দয়ামায়া না থাকলেও সে ভিতু ছিল না। আমার তো তখন ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার দাখিল। কেবল একটাই ভাবনা মাথার মধ্যে চক্কর কাটছে। কার্তিক তো মরল কিন্তু আমার কী হবে। এই ভাবনাটা আমাকে কাবু করার বদলে দেখলাম আমার মাথা অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করছে। আমি তখন বুঝতে পারলাম কার্তিকের মৃত্যু আমার উন্নতির রাস্তায় যতটা না বড় বাধা তার থেকে আমরা সবাই অনেক বেশি হুজ্জতের মধ্যে পড়েছি এই কাণ্ডটা ঘটায়। এই ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা সবাই তখন তাকিয়েছিলাম ছকুর দিকে। ওকে বলতে শোনা গেল:

'কোনো ভয় নেই, আল্লার মেহেরবানিতে আমরা সবাই সহজেই এর থেকে রেহাই পেয়ে যাব।'

মামুলি কোনো কুলিমজুর মরলে চিন্তার কারণ ছিল না, লাশটা নদীতে ফেলে দিলেই চলত। কিন্তু যে মরেছে সে কোনো মামুলি লোক নয়, যথেষ্টই বড়লোক। ওকে যেমন খাতির করে থানায় হাজির করা হয়েছিল তাতে পুলিশের কোনো অজুহাত ছিল না কেন ওর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করা হল। আমরা তাই নিজেদের ভিতর গভীর শলাপরামর্শ শুরু করলাম। আমি ছিলাম, ছকু ছিল আর বক্সিকেও এত্তেলা দিয়ে আনানো হয়েছিল। সবাই মিলে ঠিক করলাম লাশটা সদরে পাঠানো হবে, সঙ্গে দেওয়া হবে কায়দা করে লেখা একটা বয়ান। এই বয়ানে লেখা থাকবে যে গতকাল কার্তিক

পোদ্দার সুস্থ শরীরে থানায় হাজির হয়েছিল। তার আসার কারণ ছিল তার বাড়িতে ডাকাতির ব্যাপারে নালিশ দায়ের করা। কিন্তু আচমকা দারোগা আর দুজন বরকন্দাজের (যাদের নামও এই বয়ানে লেখা হয়েছিল) সামনে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তাই তার মৃত্যু নিয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই, তা ছাড়া লাশটা হুজুরের কোনো সন্দেহ থাকলে তা দূর করার জন্য পাঠানো হল।

লাশটাতে কোনো জবরদস্তির চিহ্ন থেকে গেল কি না তা ছকু ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল। কব্জিতে দড়ির দাগ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। এ নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না, কারণ দাগগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর দাগ থেকে তার মৃত্যুর কারণ হদিস করাও মুশকিল ছিল। ভালো করে দেখার পর ছকু বলে উঠল, 'শালা যে কী করে ফৌত হল আমার মাথায় ঢুকছে না, মনে হয় ভয়ের চোটেই ফৌত হয়ে গেছে। এইসব তিলি, তামুলি জাতের লোকেরা সহজে মরে না। একবার একটা ডোমকে হাত-পা বেঁধে সারা রাত ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সকাল হলে দড়ি খুলে দেখি একেবারে বুলবুলের মতো তাজা! এক সের চিঁড়েগুড় খেয়ে নিল! এই তামুলিগুলো হচ্ছে আসল বজ্জাত, এদের জন্মই হয়েছে আমাদের ঝামেলায় ফেলবে বলে। দড়ি ছিঁড়ে গেল, হাত পর্যন্ত খুলে এল না আর শালা কিনা ভয়ের চোটেই ফৌত হয়ে গেল!'

ছকুর কথা শুনে কিছুটা ভরসা হল। লাশটা সিধা চালান করে দিলাম সদরে। একজন ভরসা করার মতো লোককে পাঠালাম ফকিরের কাছে, যেন সে ডাক্তারকে নাস্তাপানির খরচা দিয়ে বশ করে, যাতে ডাক্তার ময়না করার সময় দিগদারি করতে না পারে। সেইসঙ্গে এটাও বলতে বলেছিলাম, হাকিম সাহেবের বেয়ারা গোপালের সঙ্গে মোলাকাত করে ফকির যেন তাকে সব কিছু খোলাখুলি জানায় যে পোদ্দার মরে যাওয়ায় আমি কেমন বেকায়দায় পড়েছি — আমার ভাগ্য বেইমানি করেছে। আসল ফরিয়াদিরই যেখানে

মৌত হয়েছে সেখানে আমি কেমন করে ডাকাতদের খুঁজে বের করব? সময়মতো খবর পেলাম যে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তদন্তকারী ডাক্তার তার বয়ানে লিখেছিল যে কার্তিক পোদ্দারের বুকের ব্যামো ছিল আর তাতেই তার এন্তেকাল হয়। কথাটা হয়তো বেবুনিয়াদ ছিল না। সত্যিই হয়তো তার ব্যামো ছিল। কিন্তু কেমন করে সেটার এত বাড়াবাড়ি হল যে তার এন্তেকালই হয়ে গেল! ডাক্তার বয়ানে কী লিখেছিল ফকির পর্যন্ত জানতে পারেনি। ফকিরের কাছ থেকে আরো খবর এল, আমাকে চাকরিতে পাকাপাকিভাবে বহাল করা হয়েছে। হাকিম সাহেব বলেছেন, ফরিয়াদির মরে যাওয়াটা আমার দোষ হতে পারে না। আর সে যদি মরে না যেত তাহলে নিশ্চয় আমি ডাকাতগুলোকে গ্রেফতার করে ফেলতাম। এইরকম অবস্থায় আমাকে বহাল না করে তাঁর অন্য কোনো রাস্তা নেই। পরে জেনেছিলাম আমার এই সৌভাগ্যের পিছনে অন্য একটা কারণও ছিল। আদালতে যখন এই মামলাটা নিয়ে সওয়াল শুরু হয় তখন সেই বুড়ো দারোগাকে সেখানে হাজির করা হয়েছিল। হাকিম তাকে কয়েকটা ফালতু সওয়াল করলে সে ঘাবড়ে গিয়ে এমন তোতলাতে থাকে আর পিঠ চুলকোতে শুরু করে যে হাকিম সেই মুহূর্তে তাকে আহাম্মক আর দারোগার কাজে অযোগ্য বলে বরখাস্ত করেন।

এই খবরটা থানায় পৌঁছলে ছকু খুশিতে ফেটে পড়ল, 'কী! বলেছিলাম না, আল্লা মেহেরবান? এখন পিরের দরগায় যে পাঁচ পয়সার সিন্নি মানত করা ছিল চড়াতে চললাম।' এই বলে সে কোথাও না গিয়ে গাঁজায় দম দিতে শুরু করল। এইরকম একটা বেকায়দা অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমিও কিছু কম খুশি হইনি। এতে আমার যেমন হিম্মত বেড়েছিল তেমনি অনেক বেশি হুঁশিয়ারও হয়ে উঠেছিলাম। চাকরিতে পাকাপাকি বহাল আর রামচাঁদ গাঙ্গুলির কাছ থেকে বড় ধরনের উপরির আশায় কী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছিলাম সেটাও ভালোরকম বুঝতে পেরেছিলাম। এই খতরনাক কাজটা করার জন্য আমায় প্রতাপ গাঙ্গুলিকে ডাকাত বলে গ্রেফতার করতে হত।

প্রতাপ গাঙ্গুলি যে কী জিনিস তা একটু পরেই খোলসা হয়ে যাবে। এর থেকে অনেক কম হুজ্জত করে, কোনো বিপদের মধ্যে না গিয়েই যে অনেক বেশি আমদানি হয় তা আমি পরে জানতে পারি। কয়েক দিন থানায় কাজ করার পর আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল এতদিন আদালতের কাজ করেও তা হয়নি। বজ্জাতি দু-জায়গাতেই চলত, কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রচুর ফারাক। আমার মতো লোকেদের সেখানে জায়গা ছিল দুই বা তিন নম্বরে, কিন্তু এখানে সবকিছুই আলাদা।

প্রতাপ গাঙ্গুলি

প্রতাপের বয়স হবে বছর ছত্রিশ। লম্বা মজবুত চেহারা, ফরসা রং, বড় বড় লাল চোখ আর চোখা মুখের গড়ন। ওর দাঁতগুলো ছিল খুব সুন্দর, একদম ঝকঝকে! মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল ছোট করে ছাঁটা। আর ছিল খাসা একজোড়া কালো মোচ। মুখ দেখে মনে হত না যে খুব বুদ্ধি ধরে। কথা যে খুব ভালো বলত তা-ও না। রেগে গেলেই তোতলাতে শুরু করে দিত। নেশার ঘোরেই টকটকে লাল হয়ে থাকত দুটো চোখ। উঁচু জাতের কুলীন ব্রাহ্মণ হলে কী হবে, তাড়ি গিলে প্রত্যেক দিন ও নেশায় চুর হয়ে থাকত। শ্রীরামপুর বলে একটা গ্রামে বাজারের কাছেই ছিল ওর ঘর। বাজারের ভিতর অনেকগুলো বটগাছ ছিল, তারই একটার তলায় সারাদিন টহল দিয়ে ওর সময় কাটত। গাছের তলায় রাখা থাকত একটা চৌপাই আর মাটির কলসি। সেই কলসিটার মুখ ঢাকা থাকত একটা নারকেলের আধখানা মালা দিয়ে। প্রতাপের জন্য ওটাই ছিল অনেক। কলসিতে ভরা থাকত তাড়ি আর মালাটা ঢাকনা কাম পেয়ালার কাজ করত। টহল দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে পরে চৌপাইতে বসে প্রতাপ ঢেলে নিত এক পেয়ালা তাড়ি। তারপর এক চুমুকে সেটা খতম করে কাশতে কাশতে আবার শুরু করে দিত টহলদারি। এরই ফাঁকে কোনো চাকর হুঁকো এগিয়ে দিত (একদম মামুলি হুঁকো, নারকেল মালার তৈরি)। দু-এক টান মেরেই সে সেটা ফিরিয়ে দিত চাকরের হাতে। রাজা কী করছেন সেদিকে দোকানদারদের নজর থাকত না, তারা ব্যস্ত থাকত তাদের খরিদ্দারি নিয়ে। প্রতাপকে আমআদমি রাজা বলেই সম্মান করত। স্রেফ হাটবারগুলোতে বদলে যেত এই রোজকার অভ্যাস। সেইদিন কলসি থাকত তার বৈঠকখানায়, টহলদারি ছাড়া সব কিছু চলত একইভাবে। ঠান্ডা বা গরম যেমনই মরশুম

হোক প্রতাপের পোশাক থাকত এক। খাটো ধুতি আর খালি পা। শ্রীরামপুরে যেমন অনেক গাছপালা ছিল তেমন বসতিও ছিল প্রচুর। বাইরে থেকে দেখে কোনো আন্দাজই করা যেত না, মনে হত পুরোটাই জঙ্গল। আশপাশের লোকেরা বলত ওই এলাকাটা নাকি বর্মার রাজার। এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস চালু ছিল, ইংরেজরা সব এলাকাই দখল করতে পেরেছে স্রেফ বর্মার তালুকটা ছাড়া। প্রতাপ ছিল বড়লোকের ছেলে, খানদানি বড়লোক। রামচাঁদের বাপ আর ওর বাপ ছিল দু-ভাই। প্রতাপের বাপের যখন এন্তেকাল হয় তখন ওর বয়স আট বছর। সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা হলে প্রতাপের ভাগে পড়ে সুন্দরবনের বাদা এলাকার এই জমি। হুগলি পরগনার জমিদারদের এর জন্য ওকে বছরে সাতশো টাকা খাজনা দিতে হত। ছোট থেকেই প্রতাপ লেখাপড়ার ধার ধারেনি। ভদ্রলোকের মতো চলতে শেখেনি। একে জংলি পরিবেশ তায় আইনকানুনের বালাই নেই, চারপাশে কেবল বদমাইশ আর লাঠিয়ালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্যে বেড়ে ওঠায় প্রতাপও এদের মতোই হয়ে গিয়েছিল। খুনি আর বদমাইশদের পাশে পেয়ে সে এতটাই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল যে আইন-আদালতের তোয়াক্কা করত না।

প্রতাপের নায়েব ছিল চন্দ্র দত্ত। ওর মনোমতো লোক। প্রতাপের যখন রাগ চড়ে যেত তখন এই চন্দ্র দত্তই পারত ওকে কিছুটা সামাল দিতে। এদের দুজনের কেরামতিতে এই জমিদারির আমদানি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ঠিকঠাক হিসাব করলে বছরে খাজনা দাঁড়াত বিশ হাজার টাকা, কিন্তু আদায়ের সময় জমিদারের মিলত সেই পুরনো হিসাব মাফিক সাতশো টাকাই।

এই আমদানি থেকে প্রতাপের খেয়াল মিটত না। কোনো হিসাব না থাকায় আমদানির সঙ্গে সঙ্গে সেসব খরচ হয়ে যেত। স্রেফ একটা হিসাবই প্রতাপ খেয়াল রাখত, হুগলি পরগনার জমিদারের কুঠিতে বছরের খাজনা ঠিকঠাক জমা হল কি হল না। বাকি কিছু নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ওর দৌলতে শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছিল যত বদমাইশদের আখড়া। যেসব

লোক আইনের হাত এড়িয়ে পালাতে চায় বা যে-লাঠিয়ালদের নামে দাঙ্গাবাজির নালিশ আছে তারা সব এসে এই গ্রামে জুটত। কোনোরকমে এই গ্রামে একবার চলে আসতে পারলে তাদের নিয়ে সওয়াল করার কেউ থাকত না।

গ্রামের চৌহদ্দি থেকে এত দিনের ভিতর পেয়াদারা কাউকে গ্রেফতার করে উঠতে পারেনি। অনেকবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু যারা এই চেষ্টা করেছে আখেরে তাদের ভাগ্যে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু জোটেনি। একবার কোনো একটা কারণে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব ডেম্পিয়ার, চন্দ্র দত্তকে গ্রেফতার করার জন্য হাকিমের সঙ্গে পঁচিশজন নাজিরকে[১] পাঠিয়েছিলেন গাদা বন্দুক দিয়ে। নাজিররা ফিরে এল পুরোপুরি বেহাল হয়ে। বেধড়ক মার খাওয়ার পাশাপাশি খোয়া গেছে তাদের বন্দুকও। কার্তিক এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছিল। যে, প্রতাপ পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টকেও 'ঘোল খাইয়ে' ছেড়েছে। বাঙালিদের মধ্যে এই প্রবাদটা খুব চালু। এর মানে এক তরফ অন্য তরফকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে।

কয়েক বছর আগে এক নীলকরের কুঠি লুঠতে গিয়ে প্রতাপ গ্রেফতার হয়। সেইসময় ওকে ছ-মাসের জন্য যশোরের হাজতে সাজাও খাটতে হয়েছিল। নীলকর সাহেবের সঙ্গে ওর এই কাজিয়া ছিল অনেকদিনের। যে-কোনো ওজরে দু-তরফের মধ্যে এত বেশি দাঙ্গা হয়েছে যে এখন দুজন দুজনকে এক নম্বর দুশমন বলে মনে করে। জমিদার আর নীলকরের মধ্যে যে-যে কারণে আর যে-যে ভাবে কাজিয়া হতে পারে প্রতাপ আর জনাব ব্ল্যাকের মধ্যে তার সবগুলোই হয়ে গিয়েছিল। যে তরফ যখন যা সুযোগ পেয়েছে তার ব্যবহার করতে পিছু হঠেনি। একবার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাজির হয়েছিলেন প্রতাপকে গ্রেফতার করবেন বলে। জনাব ব্ল্যাক এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ম্যাজিস্ট্রেট হাজির হয়েছেন খবর পেয়েই প্রতাপ

---

১. আদালতের কর্মচারী বিশেষ। সাধারণত পেয়াদাদের তত্ত্বাবধায়ক।

তার স্যাঙাতদের নিয়ে ফেরার হয়ে গেল। এই ফুরসতে প্রতাপের বাড়ি লুঠ করল জনাব ব্ল্যাক। ম্যাজিস্ট্রেট সদরে ফিরে গেলে প্রতাপ তার আচ্ছা আচ্ছা লাঠিয়ালদের জড়ো করল (এইরকম ওস্তাদ লাঠিয়াল আর কারো দলেই ছিল না)। তারপর পালটা হামলা চালাল জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে। এমন কায়দায় তারা সবকিছু সাফ করে দিয়েছিল যে পাখির একটা পালক পর্যন্ত সেখানে পড়ে ছিল না। অনেকগুলো ভালো জাতের রেসের ঘোড়া ছিল জনাব ব্ল্যাকের। প্রতাপের লাঠিয়ালরা সেই ঘোড়াগুলোকেও পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল। পরে প্রতাপ সুন্দরবনের জঙ্গলে সেই ঘোড়াগুলোকে কোতল করে। এই ভয়ানক কাজের জন্য তাকে ছ-মাসের সাজাও ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু যারা প্রতাপকে গ্রেফতার করবে তারা অনেকদিন পর্যন্ত তার টিকিটাও ছুঁতে পারে নি। শেষে রামচন্দ্র দাগাবাজি করায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়। জনাব ব্ল্যাকের পরামর্শমতো রামচন্দ্র নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে প্রতাপকে আর সেখানেই তাকে ধরিয়ে দেয়। সবাই যখন আয়েশ করে বৈঠকখানায় পান-তামাক খাচ্ছে তখন একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয় যে দারোগা অনেক সিপাই সঙ্গে করে এসে কুঠি ঘিরে ফেলেছে। প্রতাপ এই খবর শুনে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার দুই সর্দার ভোলা আর তিলককে তলব করে, যাতে অন্য লাঠিয়ালদের নিয়ে তারা হামলা চালায়। বাইরে কোথাও যেতে হলে প্রতাপের সঙ্গে থাকত কম-সে-কম কুড়িজন লোক। এরা হল দেশের সব থেকে চৌকস আর ওস্তাদ সড়কিওয়ালা।

ঠিক সেই সময় জানা গেল রামচন্দ্রবাবু নাকি কয়েকটা টাকা দিয়ে তাদের নদীর ওপারে মাল কিনতে পাঠিয়েছেন। তাদের মাথাতেই আসেনি যে এই অল্প সময়ের জন্য বাইরে গেলে ভাইয়ের বাড়িতে হুজুরের কোনো বিপদ হতে পারে। মাঝিকে রামচন্দ্র আগেই চুপিচুপি হুকুম দিয়ে রেখেছিল, লাঠিয়ালদের নামিয়ে দিয়েই সে যেন নৌকো নিয়ে ফিরে আসে। ফলে প্রতাপ পড়ে গিয়েছিল ঝামেলায়। একদিকে দারোগা হাজির অন্যদিকে ভরসা করার

মতো লোকেরা বেপাত্তা। কিন্তু এই অবস্থাতেও তার সন্দেহ হয়নি যে এসব তার ভাইয়ের কারসাজি। এটাও অবশ্য তার ভালোরকম জানা ছিল যে তাকে বাঁচাতে রামচন্দ্র কোনো বড় ঝুঁকি নেবে না। বিপদ দেখেও সে হয়রান হয়ে যায়নি । নিজের জায়গা ছেড়ে সিধে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, এখন কী করবে। বৈঠকখানার একধারে ছিল কাপড় দিয়ে ঢাকা মস্ত একটা সিন্দুক। রামচন্দ্র সেটা দেখিয়ে বলেছিল তাড়াতাড়ি তার ভিতর ঢুকে পড়তে। দারোগার তল্লাশি খতম হলে সে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসতে পারবে। প্রতাপের মতো বড়সড় চেহারার লোকেরও সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকে পড়তে কোনোই অসুবিধা হল না। রামচন্দ্র কাপড় দিয়ে সেটা ঢাকতে না ঢাকতেই ঘরে এসে হাজির হল দারোগা। রামচন্দ্র তাকে খুব খাতির দেখিয়ে জানাল, 'প্রতাপ যে এখানে নেই সেটা তো আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন দারোগা সাহেব।' এই কথাগুলো বলার সময় সে গলার আওয়াজ এত চড়িয়ে রেখেছিল যাতে প্রতাপের কানেও ঢোকে। দারোগার জানা ছিল প্রতাপের হদিশ সেখানেই মিলবে, তাই রামচন্দ্রের কথা শুনে সে প্রথমে একটু ঘাবড়েই গেল। কিন্তু রামচন্দ্রের মুখের দিকে নজর পড়তেই তার সন্দেহ একেবারে গায়েব হয়ে গেল। তার মুখে তখন ইশারার হাসি আর আঙুল তাক করে আছে সিন্দুকটার দিকে। ইশারাটা বুঝতে এতটুকু সময় লাগল না। পেয়াদাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম গেল সব ছেড়ে বৈঠকখানায় হাজির হওয়ার। কেউ যেন সেখানে আসতে-যেতে না পারে, এমনকী রামচন্দ্রবাবুও। সিন্দুক ছাড়া আর কিছু তল্লাশি নেওয়ার ছিল না। তার মধ্যে থেকে প্রতাপকে টেনে হিঁচড়ে কাবু করে বের করে আনা হল।

এই ঘটনার পর হাজত থেকে সাজা কাটিয়ে ফিরে এলে দোস্ত-দুশমন কাউকেই আর প্রতাপ বিশ্বাস করতে পারত না। বাজারে গাছের নীচে সে যখন তাড়ি খেয়ে টহল দিয়ে বেড়াত সেই সময় তার ভাই, নীলকর কিংবা পুলিশের সঙ্গে তার লোকেদের টক্করের কোনো খবর এলে তার একটাই

জবাব ছিল — মারো। কেমনভাবে সেটা হবে বা তার ফল কী দাঁড়াবে সেইসব প্রতাপ তোয়াক্কা করত না। ওর ছিল একটাই কথা — মারো। নায়েব চন্দ্র দত্ত আর ওর লাঠিয়ালরা কয়েক বছর ধরে সেই কাজই করে যাচ্ছিল। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট থেকে দারোগা কারো রেহাই ছিল না। এক দারোগা একবার প্রতাপকে গ্রেফতার করতে গেলে হাত-পা বেঁধে সে তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। বরাত জোরে দারোগা যেখানে ভেসে উঠেছিল সেখান দিয়ে তখন একটা নৌকো যাচ্ছিল; তারা কোনো মতে ওই ডুবন্ত দারোগার প্রাণ বাঁচায়।

চন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতের হাকিম যে কতবার পাঁচ থেকে সাত বছর সাজার হুকুম দিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সদর আদালতেও যদি সেই হুকুম বহাল থাকত তাহলে সারাজীবন হাজতে কাটালেও মেয়াদ খতম হত না। প্রত্যেকবার কোনো-না-কোনো ফিকিরে সে সদর থেকে রেহাই পেয়ে যেত। কখনো ফাঁক থেকে যেত আইনে, আবার কখনো ঠিকঠাক সাক্ষী মিলত না। রেহাই পেয়ে পেয়ে চন্দ্র দত্তের হিম্মত গিয়েছিল বেড়ে। সে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল যে প্রতাপের জমিদারিতে একবার এক ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়লে সেই তাঁবু সে পুড়িয়ে ছেড়েছিল। এই হাকিম কোনো মামুলি লোক বা ডেপুটি ছিলেন না। কিন্তু তাতে কোনো হেরফের হল না। প্রতাপ সেই হাকিমের বিরুদ্ধে কলকাতার পাদশাহি আদালতে পালটা নালিশ দায়ের করল। তিনি আর জনাব ব্ল্যাক নাকি তার কুঠিতে লুঠতরাজ চালিয়েছেন। এই হাকিম ছিল ইমানদার। কিন্তু বয়সটা কম আর কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। কলকাতায় জনাব ব্ল্যাকের লোকেরা যদি তাঁর আদালতের খরচখরচার ব্যবস্থা না করত তাহলে তিনি শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেও পাদশাহি আদালতের সামনে নিজেকে বেকসুর প্রমাণ করতে করতে ফতুর হয়ে যেতেন। জনাব ব্ল্যাক এই হাকিমকে পুরোপুরি নিজের কবজায় এনে ফেলেছিল। হাকিমের ছিল ঘোড়ার শখ, আর জনাব ব্ল্যাক খুশি হয়ে তাঁকে শেখাতে শুরু করেছিল

কী কায়দায় ঘোড়াকে তালিম দিতে হয়; দেখভাল করতে হয়, দিতে হয় খাবার, চাবুক সওয়ার হতে চাইলে কী-কী করা জরুরি এইসব। জনাব ব্ল্যাক ছিল ঘোড়ার হালহকিকতে করদান।

এলেমদার লাঠিয়ালদের মালিক বলে প্রতাপের রোয়াব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে নীল রোয়া আর কাটার মরশুমগুলোতে বহু নীলকর তার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাত, এইসব কাজ করানোর জন্য সে যেন তার লাঠিয়ালদের ছেড়ে দেয়। যারা তাকে টাকা ধার দিত তাদের জন্য এই কাজটুকু করতে প্রতাপের কোনো আপত্তি ছিল না। টাকা ধার নেওয়ার সময় সে যে-কোনো চুক্তিতে সই করে দিত। কারণ শোধ করার কোনো দায় তার ছিল না। এটাও প্রতাপ ভালোই জানত যে, আদালতের কোনো রায়েই ওকে কাবু করা যাবে না। নিজের জমিদারিও ভালোমতোই দেখভাল করত। আসলের পাঁচগুণ দামে সেগুলো সে বাঁধা রেখেছিল ভুয়ো লোকেদের কাছে। তালুক নিলামে চড়িয়ে টাকা হাসিল করার পথও ছিল তাই বন্ধ। অবশ্য সেইরকম কোনো লোকও ছিল না যে প্রতাপের তালুক নিলামে উঠলে দর হাঁকার মতো হিম্মত দেখাতে পারে। জনাব ব্ল্যাকের অনেক কিছু করার মতো সাহস থাকলেও এই কাজ করার সাহসটা ছিল না। প্রতাপ যে খুব পয়সাওয়ালা লোক ছিল তা নয়। ঘরগেরস্থির খরচখরচা ছিল বাঁধা। কোনো বালাই ছিল না পুজোপাঠের। তার একমাত্র ছেলে বিহারীবাবু খুব শক্তসমর্থ ছিল না। চোদ্দো বছর বয়স হলে কী হবে পায়রা নিয়ে খেলা করতে করতেই সে দিন কাবার করে দিত। যে টাকা আমদানি হত তাতে প্রতাপের নবাবের হালে থাকার কথা। নায়েব চন্দ্র দত্তও যে পয়সা করতে পেরেছিল তা-ও না। প্রতাপ টাকা নিয়ে কী করত ঠিকঠাক সেই জবাব কেউ দিতে পারত না। অনেকেরই সন্দেহ ছিল এই টাকার বেশিটাই খরচ হত সদরে।

জনাব ব্ল্যাক আর প্রতাপের দুশমনি ছিল মারাত্মক। দুই তরফের কেউ কারো মুখোমুখি হলে রেহাই ছিল না। যখনই দুই তরফের মোকাবিলা হত

তখন প্রতাপের জিত ছিল বাঁধা। জনাব ব্ল্যাকের হয়ে যারা কাজিয়া করত তারা ছিল পশ্চিমা আর প্রতাপের লোকেরা ছিল বাঙালি। এই পশ্চিমা লোকগুলো নিজেদের এলাকায় ভালোই লড়াই করত। কাছারি বা কুঠিতে হামলা হলে তারা জান কবুল করে দিত, কিন্তু খোলা ময়দানে বাঙালি সড়কিওয়ালাদের মোকাবিলা করার হিম্মত তাদের ছিল না। এই বাঙালিগুলোর এমনই বেহাল চেহারা যে জনাব ব্ল্যাকের মুষ্কো জোয়ানদের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। তবে রোগাপটকা হলে কী হবে এরা দারুণ তুখোড়। বাঁশের ডান্ডার আগায় সরু সরু বর্শার ফলা লাগানো সড়কি হাতে এদের কেরামতি ছিল দেখার মতো। কাজিয়া করতে যাওয়ার সময় এক-একজনের সঙ্গে থাকত পাঁচ-ছটা সড়কি। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে থাকা দুশমনদের এরা সড়কি ছুঁড়েই ঘায়েল করে দিত। আর সামনাসামনি কাজিয়া হলে এগুলো দিয়েই গেঁথে ফেলা হত। যারা ডান হাত ব্যবহার করে তাদের বাঁ হাতে থাকত ঢাল আর বাকি সড়কি। এই ঢালগুলো ছিল বেতের তৈরি। তার ওপর কাঁচা চামড়া দিয়ে ছাওয়া। তরোয়াল, সড়কির খোঁচা বা ঢিলের হাত থেকে রেহাই পেতে এই ঢালই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু টোটার সামনে এই ঢালের কোনো জারিজুরি খাটত না। ঢাল ফুঁড়ে টোটা বেরিয়ে আসত। খোলা ময়দানে কাজিয়া হলে প্রতাপের সড়কিওয়ালাদের জিত ছিল বাঁধা। জনাব ব্ল্যাকের পশ্চিমা লোকগুলোকে মার খেয়ে সারা শরীরে চোট নিয়ে ফিরে আসতে হত। খুব বেশি চোট লাগত হাত-পা কিংবা থাইতে। সড়কিওয়ালাদের একটা রেওয়াজ আছে, খুব বেহাল অবস্থায় না-পড়লে শরীরের খাস জায়গায় চোট দেওয়া যাবে না। সামনাসামনি মোকাবিলা হলে তবেই এইসব সওয়াল ওঠে। দূর থেকে সড়কি চালানোর সময় এইসব রীতি রেওয়াজের কথা কারো মাথায় থাকতে পারে না। সড়কির লড়াই খতম হলে তাই হামেশাই নজরে আসত কারো না কারো গভীর চোট লেগেছে বুকে কিংবা মাথায়। কখনো কখনো এইসব চোট ভয়ানক হয়ে উঠত। জনাব ব্ল্যাকের হাজার

চেষ্টা, ওষুধেও কোনো উপকার হত না। খুব কম লোককেই দেখা যেত এরপরও বেঁচে থাকতে।

জনাব ব্ল্যাক জীবন শুরু করেছিল ফৌজে। বরকন্দাজদের হাতে বন্দুক দিয়ে আর তাদের কুচকাওয়াজ করিয়ে কিছুদিনের মধ্যে সে নিজেই একটা ছোটখাটো ফৌজ বানিয়ে তোলে। বরকন্দাজদের মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে গাদা বন্দুক। এই বন্দুকগুলো পাঠিয়েছিল ব্ল্যাকের কলকাতার ফয়লারা[১]। এবার চাকা পুরোপুরি ঘুরে গেল। এখন থেকে কাজিয়ার সময় ব্ল্যাকের ফৌজের সামনে প্রতাপের সড়কিওয়ালারা আর দাঁড়াতেই পারত না। বন্দুকে ঠাসা হত দু-নম্বর টোটা, জনাব ব্ল্যাকের জবানে, 'আঙুরের থোকা'। ঢাল দিয়ে টোটা আটকানো গেলেও গাদা বন্দুকে ঠাসা ছররা ভয়ানকভাবে চারপাশে ছড়িয়ে যেত। ঢালগুলো লম্বায় হবে এক হাত আর চওড়া আধ হাত। একজন জোয়ানকে ঢাকার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকবার বন্দুক দাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের লোকেরা চারপাশে ভেড়ার পালের মতো ছড়িয়ে পড়ত। ঢালের পিছনে গুড়ি মেরে বসেও তারা বন্দুকের মোকাবিলা করতে পারত না।

অনেক চৌকস সড়কিওয়ালা এসে হাজির হয়েছিল প্রতাপের কাছে। তারা নাকি বন্দুকের সামনেও কেরামতি দেখাতে ওস্তাদ। লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে এলে দেখা যেত তাদেরও ওই একই হাল। বন্দুকের সামনে এদের কোনো কায়দাই খাটেনি।

এই অবস্থা যে চলতে দেওয়া যায় না সেটা বুঝতে পেরে প্রতাপ শুরু করল বন্দুকের ব্যবহার। দুই তরফের মধ্যে কয়েক দফা ভয়ানক কাজিয়াও হল। ব্ল্যাকের তালিম পাওয়া ফৌজের বিরুদ্ধে সড়কিওয়ালাদের হাতের গাদাবন্দুক ততটা বাহাদুরি দেখাতে পারল না। সেই সময় গ্রামাঞ্চলে আইনকানুন মেনে চলার রেওয়াজ ছিল না বললেই চলে। কাজিয়ায় চোট পেয়ে মারা গেলে লাশগুলোর গতি হত কোনো বড়সড়ো নদীতে, অবশ্য

১. কর্মচারী, কেরানি

লাশ যাতে ভেসে না ওঠে। তার জন্য পেটটা স্রেফ ফাঁসিয়ে দেওয়া হত। ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়ার থেকে এই বন্দোবস্ত অনেক সহজ ছিল আর খরচও হত কম। তা না হলে থানার দারোগা আর তার লোকেদের ঘুষ দিতে দিতে জেরবার হতে হত। তাতেও রেহাই মিলত না। দায়রা আদালত দুই তরফকেই শান্তিভঙ্গ করার অভিযোগে সোপর্দ করত। শেষে ফয়সালা হত সদরে।

দাঙ্গা হতে চলেছে শুনলেও আমরা দারোগারা তল্লাশির মধ্যে যেতাম না। আসলে এরকম কিছু করা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। তার উপর আনাড়ি কিছু চাপরাশি, যাদের হাতিয়ার বলতে জং ধরা কয়েকটা তরোয়াল, তা-ও ঠিকঠাক চালাতে জানে না, তাদের নিয়ে দুই তরফের সড়কি-বন্দুকওয়ালা তিনশো লোকের মোকাবিলা করা কি সম্ভব? এইরকম সময়ে এত্তেলা পাঠালে হাকিমকেও বলতে শুনেছি, 'লড়তে দাও, সব খতম হোক, তারপর আমি পৌঁছে দুই তরফের মধ্যে থানা গাড়ব।' আমার একটা দুর্ভোগের কথা এইসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে যেখানে তা হয়েছিল সেই জেলার নাম আমি কবুল করছি না। সেই সময় যিনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন পরে তিনিই আবার সদরে হাকিম হন। হুজুরের দপ্তর থেকে আন্দাজ পাঁচ মাইলের ভিতর দুই জঙ্গবাজ জমিদারের কাজিয়া হতে যাচ্ছিল। দারোগা জানাল এই কাজিয়া বন্ধ করার হিম্মত তার নেই। দুই তরফের তিন-চারশো লাঠিয়াল কাল সকাল হলেই মাথা ফাটাফাটির জন্য তৈরি। খবর পেতেই হাকিম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সরেজমিনে গেলেন। ইচ্ছে কাজিয়া থামানো আর লাঠিয়ালদের গ্রেফতার করা। কিন্তু তিনি পৌঁছতে একটু দেরি করে ফেলেছিলেন। তার ফাঁকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কাজিয়া। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কাছ থেকে তিনি সবটাই দেখলেন। তারপর কাজিয়া খতম হলে চুপচাপ ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলেন। যে-কোনো বুদ্ধিমান লোক এটাই করবে।

প্রতাপের ইতিহাস জনাব ব্ল্যাকের সঙ্গে এমন পরতে পরতে জড়িয়ে যে একজনের কথা বলতে হলেই অন্যজনের কথা বলতে হয়। এরপরে জনাব ব্ল্যাকের কাণ্ডকারখানা নিয়ে আরো গল্প শোনাব। জনাব ব্ল্যাক আর প্রতাপ দুজনেই তেজি লোক। আবার দুজনের মধ্যে ফারাকটাও ছিল অদ্ভুত। প্রতাপের ছিল গোরাদের মতো জেদ আর ব্ল্যাকের ছিল বাঙালিগুলোর মতো ধড়িবাজের বুদ্ধি। আমি তো এদেশি মানুষ, তাই এখানকার লোকেদের চরিত্র আমি ভালোই বুঝতে পারি। দারোগা হওয়ার পর সাহেব কিছু কম দেখিনি — সাহেব বলতে আমি নীলকর সাহেবদের কথা বলছি। এরা এখন এমন সব জেলায় কুঠি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছে যেখানে হাঙ্গামা লেগেই আছে। বিশেষ করে কোনো জমিদারের সঙ্গে কাজিয়া বেধে গেলে এরা চেষ্টা করে নিজের এলেম আর হিম্মতেই সবটা সামাল দেওয়ার। ফৌজদারি মামলায় বাঙালিদের থেকে এদের লেগে থাকা অনেক বেশি নজরে পড়ার মতো। বেশির ভাগ আহেলা[১] যেমন মামলায় হেরে গেলে নিরাশ হয়ে যায়, গোরাদের কিন্তু তেমনটা হতে দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত ফিরিঙ্গিদের টিকে থাকতে সাহায্য করে তাদের জেদি স্বভাব। জালিয়াতির মামলায় অবশ্য আহেলাদের ধারেকাছে পৌঁছনোর হিম্মত সাহেবদের নেই। এখানে তারা বাজিমাত করে বসেই আছে। যে-কোনোরকম অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য তারা তাদের বাড়িতে পুরনো মোহর দাগা কাগজ মজুদ করে রাখে। কোনো জমিদারি বা নীলকুঠিতে চাকরি করা শুরু করলেই গোমস্তা, নায়েব আর মালিকদের বিশ্বাসী লোকেরা এই পুরনো মোহরদাগা কাগজ কেনা শুরু করে দেয়, মালিকের নামে, যাতে নোকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময়, জায়গামাফিক জাল খালাসের হুকুম, রসিদ, পাট্টা, কবুলিয়ত, দাখিল করতে পারে।

দারোগার চাকরি করার সময়ে আমার অনেকবার সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশের এইসব হিকমতি জালিয়াতদের কামকাজের তরিকা কাছ থেকে

১. অধিবাসী, নেটিভ

দেখার। এই লোকগুলোর ফেরেববাজি তারিফ করার মতো। নন্দকুমারের জামানা থেকে (যে-ব্রাহ্মণকে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ফাঁসিতে লটকেছিলেন) আজ পর্যন্ত বাঙালি জালিয়াতরা অন্য সব জাতকে পিছনে ফেলে তাদের নিশান উঁচু রাখতে পেরেছে। যে-কোনো নতুন কাগজকে পুরনো বানানো তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। যে খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া হয় তা জলে ভিজিয়ে তার মধ্যে কাগজ ডুবালেই কাম ফতে। এরপর দলিল যে একশো বছর পুরনো নয় কে বলবে! অনেক সময় দলিল থেকে কোনো অপছন্দের কথা মুছে ফেলার জরুরত পড়ে। আনাড়ি বজ্জাত হলে এই শব্দটা গায়েব করার জন্য ব্যবহার করত চাকুর ডগা, কিন্তু বাঙালি ফেরেববাজ হলে এই কাজটা করবে একেবারেই অন্য কায়দায়। তারা ব্যবহার করবে আরশোলা। অপছন্দের শব্দটার উপর মিষ্টি কিছু মাখিয়ে তারা আরশোলার সামনে রেখে দেবে। কিছু সময় পরেই দেখা যাবে আরশোলা জায়গাটা খেয়ে নিয়েছে।

আহেলোদের সঙ্গে গোরাদের আরেকটা বড় ফারাক হল: একজন ইংরেজ কিছুতেই ধড়িবাজি করতে পারে না, অন্য দিকে আহেলো কিন্তু তার দোস্ত বা দুশমন সবার সঙ্গেই একইভাবে মাখামাখি করতে পারবে আবার হাসতেও পারবে। এটাই হল তাদের স্বভাব। প্রতিহিংসাপরায়ণ নয় বলে তাদের শরীরে রাগও নেই। তারা প্রত্যেকটা চাল দেয় হিসেব করে। বদলা নেবে বলে তারা কারো সর্বনাশ করতে চায় না। তাদের একটাই উদ্দেশ্য: কাজটা করলে কতটা লাভ হবে। এইসব লোকগুলোর ন্যায়-অন্যায়ের কোনো স্মৃতিই থাকে না। যে-কোনো লোক, যদি সে তার বাপের খুনিও হয়, তবু তার কাজ করে কিছু ফয়দা হলে একজন আহেলো সব ছেড়ে সেটাই করবে। ইংরেজরাও যদি এদের মতো ধড়িবাজি করতে পারত তাহলে এদের যতই কেরামতি থাকুক কিছুতেই গোরাদের সঙ্গে এরা এঁটে উঠতে পারত না। নীলকর যখন জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গা করে তখন সবটাই তার কাছে খুব মামুলি ব্যাপার। কিন্তু তার

শুভাকাঙ্ক্ষীরা সবসময় ভয় পায় যে তার কাছে যেটা মামুলি ব্যাপার জমিদারের কাছে তা নয়। আহেলাদের যদি এই খেয়ালটুকুও না থাকত তাহলে ইংরেজদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় তাদের আর কোনো ভরসাই থাকত না।

জনাব ব্ল্যাক

জনাব ব্ল্যাকের বয়স হবে বছর চল্লিশেক। মজবুত গড়ন, মাঝারি রকমের লম্বা, নীল চোখ আর চুলের রঙও পুরোপুরি কালো নয়। গায়ের রং নিশ্চয়ই একসময় ফরসা ছিল কিন্তু এখন রোদে-জলে সেটাই বাদামি হয়ে গেছে। ওর চেহারার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য নীল চোখের শান্ত চাহনি আর কঠোর মুখের ভাব। মুখের কঠোরতা ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত। ব্ল্যাক ছিল কড়া ধাঁচের লোক। কিন্তু সবার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল সহবতপূর্ণ। ও ছিল এতটাই লেফাফাদুরস্ত[১] আর কথাবার্তায় এত চৌকশ যে কোনো আহেলাও ওর সঙ্গে মোলাকাত করতে এলে বশ হয়ে যেত। জনাব ব্ল্যাকের পড়ালেখার তালিম ছিল। একসময় ফৌজে জমাদারের নোকরিও করেছে, তবে পরে কোনো কারণে সেই নোকরি থেকে ইস্তফা দেয়। ওর নোকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার কারণ নিয়ে বাজারে এতরকমের কিস্‌সা চালু ছিল যে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে তা বুঝতে পারাটাই মুশকিল। যার সঙ্গে ব্ল্যাকের সাদি হয় তার কোনো দায়াদ[২] ছিল না। মেমসাহেবের বাপ তার লেড়কির জন্য একটা জমিদারি ছেড়ে গিয়েছিল। বেগম সাহেবার কিসমত ভালো ছিল। সাদির সময় জমিদারি নিয়ে এমন ফইজত[৩] শুরু হল যে তার স্বামী ওই জমিদারির খাজনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। তা না হলে জনাব ব্ল্যাক কবেই সেসব বেচে টাকাগুলো রেসের ময়দানে বা বাবুয়ানি করতে উড়িয়ে দিত। প্রতাপ আর ব্ল্যাকের মধ্যে দুশমনি থাকলেও একটা জায়গায় ওদের

১. আদবকায়দায় বা বাইরের আচরণে নিখুঁত

২. উত্তরাধিকারী

৩. হাঙ্গামা

খুব মিল ছিল। টাকার আমদানি কীভাবে হবে আর কেমন করে তা খরচ হবে সেসবের ওরা তোয়াক্কা করত না। সাদি হয়ে গেলে ব্ল্যাক তার শাশুড়ি আর বিবিকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে জমিদারির দখল নিতে এল। খাজনা থেকে সালিয়ানা মুনাফা হত পনের হাজার তনখা। শাশুড়ি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন জমাদার সাহেবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা কত বড় ভুল হয়ে গেছে। জামাই আস্তে আস্তে পুরো জমিদারিটাই নিজের এখতিয়ারে নিয়ে এসেছিল। কেবল সরকারের ঘরে খাজনা মেটানোর দায়টা মেহেরবানি করে ছেড়ে রেখেছিল শাশুড়ির উপর। খাজনা উসুলের ব্যাপারে জামাইয়ের খুব কড়া নজর ছিল। দরকার পড়লে ফৌজি কায়দাও ইস্তেমাল করতে রেয়াত করত না। নায়েব আর তহশিলদারদের এইরকম কোনো আজমাইশ[১] না থাকলেও তার হুকুম মোতাবেক চলতেই হত। উসুল বাকি সব কিছু সে একেবারে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে তবে ছাড়ত। একেবারে ইয়ারদোস্তের মতো তাদের কাঁধে হাত রেখে ব্ল্যাক স্রেফ বলত, 'মিটিয়ে দাও বাবা, মিটিয়ে দাও,' আর তারাও মিটিয়ে দিত। সর্দার নায়েব একবার উসুলের তনখা থেকে সরকারের খাজনা জমা দেওয়ার কথা বললে তাকে শুনতে হয়েছিল সেইসব বন্দোবস্ত নাকি মেমসাহেবের সঙ্গে বসে ঠিক করে নিতে হবে। নায়েব কথাটা মেমসাহেবের কানে তুললে তিনি জামাইকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, রেওয়াজ হচ্ছে আদায়ের টাকা থেকে সরকারের খাজনা মেটানো, বাকিটা সে তার খেয়ালমাফিক খরচ করতে পারে। জামাই এর জবাবে বলেছিল, তাঁর তো যথেষ্ট ধনদৌলত আছে, এখন তাই দিয়েই তিনি ওই কাজটা করুন। খাজনা যা আদায় হচ্ছে তার বেশিটাই চলে যাচ্ছে নিজের কিছু কর্জ মেটাতে। আস্তে আস্তে সবকিছু সে ঠিক করে ফেলবে। মেমসাহেব তখনও জনাব ব্ল্যাককে ভালোমতো চিনে উঠতে পারেননি। তিনি ফের একদিন প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করলে জামাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দেয়।

---

১. ইচ্ছে

বেচারা মেমসাহেব তাজ্জব বনে গেলেও জামাইকে আর ঘাঁটাননি। নিজের তহবিল থেকে যেমন সরকারের ঘরে খাজনা দিচ্ছিলেন তেমনই দিয়ে যেতে লাগলেন। অন্যদিকে জনাব ব্ল্যাক জোর কদমে উসুল করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন তেজিভাবে আমদানি হচ্ছিল তেমন সেসব খরচও হয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। খরচের কারণ অবশ্য কর্জ ছিল না, খুব ঠেকায় না পড়লে ব্ল্যাকের ভাবনাতেই থাকত না সেসব। ঘোড়া খরিদ করতে, কুঠি বানাতে, আখ আর অ্যারারুটের চাষ করতে কিছুটা খরচ হচ্ছিল, তবে বেশিটাই বেরিয়ে যাচ্ছিল পড়শির সঙ্গে কাজিয়ায়।

এইসময় নীলকুঠি বানানোর পাগলামি ব্ল্যাকের ঘাড়ে সওয়ার হল। জনাব ব্ল্যাকের বহু লোকের সঙ্গে চেনা পরিচয় ছিল। রেসের ময়দানে এমনসব দোস্ত হয়েছিল তার, যাদের লেনদেন বড় বড় কারবারিদের সঙ্গে। এদের সুবাদে, জমিদারির পরিচয়ে আর নুমাইশি[1] বাতচিতের ফলে মেসার্স রিসকল অ্যান্ড কোম্পানি তাকে তাদের কারবারে নিয়ে নিল। এরাই ছিল সেই সময়ে কলকাতার সব থেকে বড় নীলের কারবারি, যারা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পুঁজি নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এদের দেওয়া পুঁজি নিয়ে জনাব ব্ল্যাক বানিয়ে তুলল নীলকুঠি। কয়েক বছরের ভিতর সাতখানা নীলকুঠি বসে গেল আর সেইসঙ্গে একটা চিনির কল। এই সবকটারই সে ছিল ম্যানেজার আর হিস্‌সাদার।

জনাব ব্ল্যাকের সামনে তখন খোলা ময়দান। একদিকে অফুরান টাকার জোগান আর অন্যদিকে তার এলেম, এই দুইয়ের মোকাবিলা করার মতো আর কেউ ছিল না। জোরজবরদস্তি করে সে গ্রামের পর গ্রাম নিজের বিবির জমিদারির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। সেই সময় প্রতাপ এসে রুখে না দাঁড়ালে তামাম মুলুকটাই সে কবজা করে ফেলত। আহেলা জমিদারদের মধ্যে প্রতাপই

১. লোক-দেখানো

প্রথম হিম্মত দেখাতে পেরেছিল। বেশির ভাগ জমিদারই তাদের গ্রাম-কাছারি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভেগে যায়। এমনও হয়েছে যে দু-বছরের মধ্যে খাজনাটা পর্যন্ত কেউ উসুল করতে আসেনি। প্রতাপ গাঙ্গুলি যে জনাব ব্ল্যাকের সঙ্গে টক্কর নিতে পেরেছে এর জন্য অনেকেই বুকে বল পেল। তারা এবার প্রতাপের সঙ্গে জোট বাঁধল। প্রতাপ আর ব্ল্যাকের জঙ্গকে গ্রামের আম ইনসান লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করত। আমি যখন তেজপুর থানায় দাখিল হলাম ততদিনে এই জঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। আর যতদিন আমি ওই থানায় ছিলাম ততদিন এই কাজিয়া চলতে দেখেছি। তাই যেসব কিস্‌সার কথা আমি বলছি সেগুলো হয় আমার দেখা না হলে শোনা। মনে করে করে বলতে হচ্ছে বলে কিস্‌সাগুলো আগুপিছু হয়ে যেতেই পারে, আসলে যেগুলো প্রথমে খেয়াল হচ্ছে সেগুলোই বলছি।

এই কাজিয়া থেকে কোনো তরফেরই কিছু ফয়দা হয়নি। খাস করে মেসার্স রিসকল অ্যান্ড কোম্পানির তো নয়ই। যখন এই জনাবেরা ধীরে ধীরে দেউলিয়া হতে বসলেন তখন তাঁরা ব্ল্যাকের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন চার লাখ টাকার কর্জের বোঝা। টাকা এসেছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে। হিস্‌সাদারদেরই কর্জ মেটাতে হত। জনাব ব্ল্যাকের নীলকুঠিগুলো আদালত পাওনাদারদের হাতে তুলে দিল। তারা আবার কয়েক বছর বাদে এক জাঁহাবাজ নীলকরের কাছে আটশো টাকায় সেইসব বেচে দিল। এই নীলকরের সঙ্গে জনাব ব্ল্যাকের তলে তলে একটা সমঝোতা হয়েছিল। কিছুদিন পরেই দুই হিস্‌সাদারের মধ্যে বখেরা শুরু হলে কুঠিগুলো বরবাদ হয়ে গেল। আমার তো মনে হয় লাভ হয়েছিল গোরু চরাতে আসা ছোকরাগুলোর। নীলের চৌবাচ্চাগুলো এখন তাদের বসে খানা খাওয়ার জায়গা।

প্রতাপের সঙ্গে কাজিয়ায় ব্ল্যাকের দুটো খুব বড় সুবিধে ছিল। এক, তার টাকার কোনো অভাব ছিল না, নিজের নাহলে কী হবে. আমাদের রিশবত দেওয়ার সময় সে দরাজভাবে সেগুলো খরচ করত আর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ছিল তার দহরম-মহরম। যেসব ছোকরা হাকিম সদরে আসত তাদের বুদ্ধি

তখনো পাকেনি, তাই জনাব ব্ল্যাকের মতো গভীর জলের মাছকে তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। এরা সবাই তাল-হুঁশ খুইয়ে ঘোড়ার ব্যাপারে মশগুল হয়ে পড়ত। তাদের দিক থেকে এটা যদি কমজোরি হয় তাহলে জনাব ব্ল্যাকের কাছে সেটাই হয়ে উঠত জোরের জায়গা। জান-পহ্চান হওয়ার হপ্তাখানেকের মধ্যেই ব্ল্যাক তাদের আঙুলের ডগায় নাচাতে শুরু করে দিত। তাদের ঘোড়ার রোগ হলে ব্ল্যাককেই দেখা যেত ইলাজ করতে, রুপিয়ার জরুরত পড়লে সে-ই সামলে দিত সব। মেহমানদের জন্য তার ঘরের দরজা থাকত হাট করে খোলা। তার লেফাফাদুরস্ত সহবতের দরুন হাকিমরা তাকে এড়াতে পারত না। আমরাও এইসব ভালোই বুঝতাম, তাই দুই তরফের কোনো মামলায় তল্লাশি করতে গেলে তার নতিজা[১] নিজেদের মতো করে ঠিক করে নিতাম। দুই তরফের রিশবত এক হলে বা প্রতাপের দিক থেকে একটু বেশি হলেও আমরা ব্ল্যাকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখতাম না। কারণ আমাদের জানা ছিল হুজুরের দরদটা কার দিকে। স্রেফ প্রতাপ যখন খুব ঝামেলায় পড়ে আমাদের কাছে এমন ডালি নিয়ে হাজির হত যা ছাড়া যায় না, কেবল তখনই আমরা তার পক্ষে রিপোর্ট দিতাম।

সদরের জজ সাহেবকেও জনাব ব্ল্যাক ঠিক কায়দা করে নিজের কব্জায় এনে ফেলেছিল। এই জনাবের ঘোড়ার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন ইমানদার ইনসান। জনাব ব্ল্যাক সেটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে গির্জায় যাওয়া শুরু করে দিল। রবিবারের সকালে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সিধা গির্জায় গিয়ে হাজির হতে পারত। জজসাহেব থাকলে ব্ল্যাককে দেখা যেত হাতে মস্ত এক কিতাব নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে দোয়া মাঙছে। সে এমন একটা জায়গা বেছে নিত যে জজসাহেবের নজরে না পড়ে উপায় ছিল না। এরপরেই একদিন দেখা গেল যে একটা লুটের মামলায় ফেঁসে যাওয়া ব্ল্যাকের কয়েকজন লোককে জজসাহেব রেহা করে দিচ্ছেন। সত্যি! ব্ল্যাকের মতো মতলববাজ আর দুটো হয় না।

---

১. পরিণতি

জনাব ব্ল্যাক বনাম প্রতাপ গাঙ্গুলির জঙ্গ

পাঠকরা নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন যে আমার মতো আনপড় একজন দারোগা কীভাবে জনাব ব্ল্যাক আর অন্য সাহেবদের এত কিস্‌সা জানলাম। অন্য কথা শুরু করার আগে এইটা বলে নেওয়া দরকার। আমার জিগরি দোস্ত ছিল জনাব ব্ল্যাকের খাস নফর। সে তার মালিকের খিদমত করছে ফৌজি জামানা থেকেই। এদেশে এসেছে তারই সঙ্গে। লোকটা ইংরেজি জবান বলতে পারত। মালিক তার কাছে কোনো কথাই লুকিয়ে রাখত না। সে ছিল আমার আর জনাব ব্ল্যাকের মধ্যে সাঁকোর মতো। তার হাতেই আমার রিশবত এসে পৌঁছত। ব্ল্যাকের সঙ্গে আমার রিস্তা পরে খারাপ হয়ে গেলেও ওর সঙ্গে আমার দোস্তি একইরকম থেকে গিয়েছিল। ওর কাছ থেকেই জনাব ব্ল্যাক আর তার সঙ্গে যেসব লোকেদের দহরম-মহরম আছে তাদের খবর মিলত। দারোগা আর দালালের যা নিয়ে বখেড়া খাড়া হয়ে যায় সেই রিশবতের বখরা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার একদিনের জন্যও কোনো মুশকিল হয়নি। এমনিতে দালালদের হিস্‌সা ছিল শ-রুপিয়াতে দশ টাকা, কিন্তু আমি দিতাম রিশবতের পাঁচভাগের এক ভাগ। কারণ যেসব খবরের হদিশ ও আমাকে দিত সেগুলো ছিল আমার কাছে খুবই জরুরি। তার উপর সে ছিল সৈয়দ, একজন মির সাহেব, তাই তার কদর দিতে আমি কসুর করতাম না। রিশবত নিয়ে লোকটার কোনো লজ্জা-ভয় ছিল না, কী করেই বা থাকে! একে সৈয়দ তায় জনাব ব্ল্যাকের পুরনো খাদিম, লাজলজ্জা থাকলে কী চলে?

প্রতি হপ্তায় জনাব ব্ল্যাক বনাম প্রতাপের কাজিয়া হত। সেইরকম কিছু শুরু করার আগেই ব্ল্যাক আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত সব পাকা করে রাখত, যাতে খেল বিগড়ে না দিই। অনেক সময় এমন আচমকা কাজিয়া শুরু হয়ে

যেত যে বন্দোবস্ত করার সময় থাকত না। সরকারি নোকর হিসাবে তখন হাকিমকে দাঙ্গার কিছুটা ঠিক ঠিক খবর পেশ করতেই হত। রিপোর্টে দুই তরফের বিরুদ্ধেই থাকত অভিযোগ। কিন্তু তারা খুশি মনে রিশবত দিয়ে এর থেকে পরে রেহাইও পেয়ে যেত। আমরা দারোগারা কোনো ঘটনার তদন্ত করে ঠিকঠাক রিপোর্ট কখনোই দিতাম না, যাতে পুরো ব্যাপারটা আমাদের আওতার বাইরে না চলে যায়। সবসময়ে কিছুটা ফাঁক রেখে দেওয়া হত। আমরা অপেক্ষা করতাম কখন তারা এসে আমাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে যাবে। লেনদেন সব খতম হলে তবেই আমরা বসতাম রিপোর্ট সাজাতে। যে তরফ কিছু ঠেকাত না বা কম দিত, অভিযোগ খাড়া করা হত তখন তাদেরই বিরুদ্ধে। এইরকম অবস্থা খুব কমই হয়েছে যখন কোনো তরফই কিছু ঠেকায়নি। এইসব সময়ে আমরা খুব দিলদার হয়ে উঠতাম। কোনো ঝামেলার ভিতর আর যেতাম না। হাকিম পর্যন্ত পৌঁছেই সব কিছু ভেস্তে যেত। কাজে গাফিলতির জন্য শুনতে হত তার ধমকধামক। এতে হয়তো আমাদের আফশোস আরো কিছুটা বাড়ত এই যা! আদমি দৌলতমন্দ হলে আর হাত খুলে রিশবত দিতে চাইলে আমরা এমন সুন্দরভাবে পুরোটা সাজিয়ে দিতাম যে ঘটনার মধ্যে যদি কোনো ফাঁক থেকেও থাকে তাহলে সেগুলোও ভরাট হয়ে গিয়ে মামলা পাকা হয়ে যেত। একবার একটা লোক এরকম একটা মামলায় আমায় যথেষ্ট রিশবত কবুল করল। ভাইয়ের বিরুদ্ধে সেই লোকটা সড়কি চালানোর মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করতে চাইছিল। মামলাটায় সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, স্রেফ ওই সড়কির চোটটা বাদে। দুটো পায়েরই গোছে এদিকে-ওদিকে হালকা চোট বানিয়েছিল সে, যাতে এক নজরে মনে হয় সড়কিটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বুদ্ধি দিলাম যে ফিরিঙ্গি ডাক্তার সব কিছু ভালো মতো পরীক্ষা না করে কোনো সুরত-ই-হাল পেশ করবে না। আর স্রেফ এইটুকু চোট নিয়ে তার সামনে হাজির হলে কোনো ভরসা নেই। বাঙালি কোনো ডাক্তারের

সাহায্য নিলে ঠিকঠাক রিপোর্ট মিলতে পারে, কিন্তু তার জন্য খরচ পড়বে দেড়শো রুপিয়া। ওই লোকটাকে দিয়ে আবার কিছু করাতে খুব ঝামেলা দাঁড়িয়ে গেল। ওর চোটগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছিল, তারপর ব্যথাও ছিল খুব। চোটগুলোর মধ্যে দিয়ে আবার সড়কি চালাতে দিতে ও কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। উপায় কিছু ছিল না যে অন্য কিছু করি। ভাং খাইয়ে জবরদস্তি ওকে পেড়ে ফেলে, পুরনো চোটের উপর চালানো হল সড়কি, ফরিয়াদির আখেরে এতে লাভই হয়েছিল। এই মামলায় আসামির বিরুদ্ধে হুকুম হয়েছিল এক বছরের কঠোর সাজা। এই লোকটা অকৃতজ্ঞ ছিল না। আমার বুদ্ধিমতো চলায় ওর ভাইয়ের সাজা হলে সে রিশবত নিয়ে কোনো কঞ্জুসি করেনি। তাই এইরকম লোককে আমি খুব ভালো বলব।

একবার জনাব ব্ল্যাক আর প্রতাপের কাজিয়া শুরু হলে প্রতাপের এক আদমিকে ব্ল্যাক তার কুঠিতে কয়েদ করে রেখেছিল। দাঙ্গায় লাগা চোট সেরে না ওঠা পর্যন্ত তাকে ছাড়েনি। এটা খুবই মামুলি ঘটনা। আসল কিস্‌সাটা হল যাকে ব্ল্যাক তার হেপাজতে রেখেছিল তার দাঙ্গাবাজ হিসাবে কিছুটা নামডাক ছিল। তার উপর সে ছিল প্রতাপের পেয়ারের লাঠিয়াল আফাজাদির ডান হাত। ঠিক হল পরের দিন সকাল হলেই ব্ল্যাকের কুঠিতে হামলা চালিয়ে তাকে খালাস করে আনা হবে। পুরো ফন্দিটাই গোপন রাখা হল। সকাল হওয়ার বহু আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে প্রতাপের লোকেরা লুকিয়ে রইল আখের খেতের ভিতর। এই খেত থেকে কুঠি ছিল খুব বেশি হলে পাঁচশো গজ। কখন আলো ফুটবে তার জন্য ওরা অপেক্ষা করছিল। এটা একটা আশ্চর্যের কথা যে, লাঠিয়ালরা কখনো রাতে গ্রাম বা কুঠিতে হামলা চালায় না। তারা মনে করে যে ওরকম কিছু করলে তাদের পেশার বদনাম হয়ে যাবে। নিজেদের তারা সিপাহি বলে আর অন্ধকারে যারা হামলা চালায় তারা হল মামুলি ডাকাত। ডাকাতের নাম শুনলেই সাধারণ মানুষ সিঁটিয়ে যায়। তাই ডাকাত হওয়াতে লাঠিয়ালদের সখত নফরত। অন্ধকারে হামলা

চালানোর ঝুঁকি অনেক বেশি আর একবার ধরা পড়ে গেলে রেহাই মেলাও যে মুশকিল সেই ভয়টা সবসময় এদের মধ্যে কাজ করে। শুধু কাজ করে বলছি কেন, এটাই হল ঘটনা। অন্ধকারে কাউকে সহজে চেনা যায় না ঠিকই, কিন্তু কাজটা যে অনেক বেশি দোষের সেই ভাবনাই আসলে তাদের ঠেকিয়ে রাখত। লাঠিয়াল যদি সাচ্চা হয় তাহলে তার মধ্যে কিছুটা বাহাদুরি থাকে। জনাব ব্ল্যাক আমাকে হামেশাই বলত যে, প্রতাপ অন্ধকারে হামলা চালালে সে অনেক সহজে কিস্তিমাত করে ফেলতে পারত। তার বক্তব্য ছিল, 'আরে, দারোগা! আহেলোরা[১] যদি তালমিল রেখে ঠিক ওয়াক্তে[২] ঠিক কাজ করতে পারত তাহলে কী আর আমরা হিন্দুস্তান দখল করতে পারতাম, নাকি যে তরিকায় চালিয়ে যাচ্ছি সেই তরিকা[৩] ইস্তেমাল[৪] করতে পারতাম?' মারদাঙ্গা শুরু করার ঠিক একটু আগেই জনাব ব্ল্যাকের এক আদমি সেখানে হাজির হয়েছিল, খুব সম্ভব আখ চুরি করতে। প্রতাপের লাঠিয়ালদের দেখতে পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে নীলকুঠিতে খবর দিল। মতি খান তাড়াতাড়ি লড়াকু আদমিদের এককাট্টা করে যেদিক থেকে হামলা হতে পারে সেখানে তাদের চৌকি দিতে রেখে এল। তারপর জনা দশ-বারো পশ্চিমা সহিস নিয়ে, মালিকের শুয়োর মারার বর্শাটা বাগিয়ে নিজেও ওত পেতে রইল।

তারা সব ঠিকঠাক জায়গায় খাড়া হতে না হতেই দেখা গেল প্রতাপের লোকেরা দঙ্গল বেঁধে এগিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছিল তাদের হুংকার। কুঠির যেদিকটা সব থেকে কমজোরি সেখান দিয়ে ঢুকতে গিয়ে প্রতাপের লোকেরা দেখল কিছু আদমি হাতিয়ারবন্ধ হয়ে তাদের মোকাবিলায় তৈরি। তখন আর ফেরা যায় না। জোট বেঁধে যারা হামলা চালাতে এসেছিল তারা এগিয়ে

১. অধিবাসী

২. সময়

৩. পদ্ধতি

৪. প্রয়োগ

যেতে লাগল ঠিকই, কিন্তু তাদের জোশ[১] অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এইভাবে প্রতাপের লাঠিয়ালরা নীলকুঠির চৌহদ্দির মোটামুটি ষাট গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এই সময়ে লাঠিয়ালদের দঙ্গল থেকে একজন ছিপছিপে লম্বা ছোকরা বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে সড়কি নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল। তারপর আসমানে লাফ দিতে দিতে আর পাক খেতে খেতে এগিয়ে যেতে থাকল। এইভাবে তেড়ে গিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল এক পশ্চিমা সহিসের উপর। এটাই ছিল তার শেষ চেষ্টা, শুয়োর মারার বর্শাগুলো গেঁথে ফেলল তার শরীরটাকে। এই নওজোয়ান লাঠিয়ালের নাম আফাজাদি। প্রতাপের খুবই পেয়ারের, বয়স বছর-চব্বিশ, ছিপছিপে লম্বা, পট্টির মতো চোয়াল ঘিরে থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে দাড়ি, গর্দান পর্যন্ত ঝাঁকড়া বাবরি চুল। সে ছিল সোজা সরল। বাজে কথা প্রায় বলতই না। তার চরিত্রের যে-দুটো দিক ছিল লক্ষ করার তা হল, প্রতাপের জন্য তার ওয়াফাদারি[২] আর জনাব ব্ল্যাকের উপর নফরত। যে-কোনো দাঙ্গায় প্রতাপের লাঠিয়ালদের মধ্যে তার কেরামতি ছিল নজরে পড়ার মতো। বুড়ি আম্মি ছাড়া দুনিয়ায় আর তার কেউ ছিল না। আম্মিকে নিয়ে আফাজাদি একটা ছোট্ট কুঁড়েতে থাকত শ্রীরামপুরে, মালিকের বাড়ির কাছেই। ছোট থেকেই সবার নজর এড়িয়ে ও বেমালুম হয়ে উঠেছিল একজন লড়াকু মরদ আর শেষ পর্যন্ত কীভাবে লাঠিয়াল হয়ে গেল তা ও নিজেই মনে করতে পারত না। জবরদস্ত অনেক দাঙ্গার সময় এই জোয়ানের ঠান্ডা দিমাগ আর জোশ দেখে লাঠিয়াল সর্দার তিলক তার মালিক প্রতাপকে বলেছিল যে, তার সাঙাতদের ভিতর আফাজাদিই সব থেকে বাহাদুর। নিজের খাস পাইকদের একজন করবে বলে মালিক যখন তার দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল এই দুর্ঘটনা।

১. উদ্দীপনা

২. আনুগত্য

জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে হামলা চালানোর এই পরিণামে হামলাবাজরা কয়েক মুহূর্তের জন্য কেমন থমকে গেল। মতি খান এই দুর্বল মুহূর্তে প্রতাপের লোকদের ইতস্তত করতে দেখে তাদের উপর খান ছয়েক গাদা বন্দুকের দু-নম্বর গোলি এমনভাবে ছুঁড়ল যে তাদের পিট্টান না দিয়ে উপায় রইল না। এটা ছিল বেইজ্জতির একশেষ। লাঠিয়ালরা যত জলদি হাজির হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি জলদি তারা ময়দান খালি করে দিল। আফাজাদির লাশটা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে রইল। প্রতাপ যখন শুনল যাকে খালাস করতে যাওয়া হয়েছিল তাকে রেহাই তো করা যায়ইনি তার উপর আফাজাদিকে পিছনে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, তখন তার মাথায় খুন চড়ে গেল। ডাক পড়ল চন্দ্র দত্তের, হুকুম হল যতজন লোক পারা যায় এককাট্টা করে সে খোদ যেন আফাজাদি যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনে, আর যদি তার এন্তেকাল[১] হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কমসে কম তার লাশটা উঠিয়ে আনে। এই হুকুম তামিল করা যে কত বিপজ্জনক আর মুশকিলের তা চন্দ্র দত্ত ভালোই বুঝতে পেরেছিল। হুজ্জত যা হওয়ার ছিল তা তো হয়েই গেছে, দুতরফের লোকই খবর নিয়ে থানায় ছুটেছে যাতে এক তরফ অন্য তরফের বিরুদ্ধে নিজেদের মনপসন্দ কিস্‌সা অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে পারে। এখন যদি নতুন করে কুঠিতে হামলা চালাতে হয় তাহলে হামলাবাজদের সঙ্গে দারোগার সামনাসামনি মোলাকাতও হয়ে যেতে পারে। কারণ সে-ও হয়তো এর মধ্যে তালাশি নিতে সেখানে হাজির হয়ে গেছে। কিন্তু এসব ঝামেলা যে একেবারে কাটানো যায় না তা নয়। দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে রুপিয়ার জোরে সবকিছু সামাল দেওয়া যায়, কিন্তু সেসব করতে হলে বহুত খরচ হয়ে যাবে। সব থেকে বড় কথা হল, মতি খানের ছর্‌রার সামনাসামনি হওয়ার বিপদ। প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার ফুর্তি যতই থাকুক না কেন আবার করে হামলা চালালে সে যে প্রথমবারের

---

১. মৃত্যু

মতোই পিছু না হটে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেটাও ঠিক। চন্দ্র দত্ত শুনেছিল জনাব ব্ল্যাকের লোকেরা খুব বড় একটা ভুল করে বসেছে। তারা আফাজাদির লাশটা কুঠির ভিতর না নিয়ে গিয়ে বাইরেই ফেলে রেখেছে। নিশ্চয় এটা ধরে নিয়ে যে তার এন্তেকাল হয়েছে। দাঙ্গার সময় কেউ খুন হলে আহেলাদের যে হুঁশ থাকে না এটা কোনো নতুন কথা নয়। এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন জনাব ব্ল্যাকও কুঠিতে গরহাজির ছিল। তাই তার লোকেরা এই বেয়াকুবি করে ফেলেছে। এখন যে কাজটা সহজে করা যায় তা হল দুজন মরদকে জেনানা সাজিয়ে পাঠানো যাতে কুঠির লোকেরা ভেবে না বসে যে ফের হামলা হতে চলেছে, আর মওকামাফিক আফাজাদির লাশটা উঠিয়ে আনা। ফন্দিমতো কাজ হাসিল হল। দুজন জেনানা সেজে লাশটা উঠিয়ে আনল, ব্ল্যাকের লোকেরা কোনো ঝামেলাই করল না।

আফাজাদির তখনো মৌত হয়নি। একটু নাড়াচাড়া হতেই তার চোটগুলো থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল। তাকে এনে শুইয়ে দেওয়া হল প্রতাপের বৈঠকখানার মেঝেতে। এটা সাফ সাফ জাহির হয়ে গিয়েছিল যে এতটা রক্ত ঝরার পর আফাজাদি আর জিন্দা থাকবে না। ও চুপচাপ চিত হয়ে পড়েছিল, ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছিল সারা শরীর। ওর আম্মি তখন ঘরে ছিল না। ব্যাটা যে কটা পয়সা তার হাতে তুলে দিত সেই দিয়ে বুড়ি তুলো খরিদ করে সুতো তৈরি করত। সেই সময় সে সুতো বেচতে চলে গিয়েছিল। প্রতাপ এসে আফাজাদির সামনে একটা চৌপাইয়ের উপর বসল। ওর মুখের গতিকেই মালুম হচ্ছিল গভীর আফশোস — দারুণ রেগে গেলে বা সমস্যা দেখা দিলে মুখ দিয়ে আর কথা সরত না ওর। প্রতাপ শূন্য চোখে তাকিয়েছিল আফাজাদির দিকে। একটু বাদে বাদেই কেমন অদ্ভুতভাবে ঢোক গেলার চেষ্টা করছিল, যেন অস্বস্তিকর কিছু একটা এসে কলজের কাছে আটকে যাচ্ছে। চোট লাগা লোকটার যে এন্তেকালের দেরি নেই তা ও ভালোই মালুম করতে পারছিল; তাই এবার প্রতাপ মুখ খুলল, 'আফাজাদি আমার ব্যাটা, বল

তোর জন্য আমি কী করব?'

মৌতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জবাব দিল, 'কিছু না মালিক, আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমার যাওয়ার পালা।' একটু দম নিয়ে আবার ও বলতে শুরু করল, 'তোর নিমক খেয়েছি, তোর কাম করতে গিয়ে এন্তেকাল হবে এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে!' ওর কথা বলা থেমে গেল, বুজে এল দুই চোখ। প্রতাপ কোনো কথা না বলে গুম মেরে বসেছিল, দারুণ রাগে স্রেফ বার বার কুঁচকে যাচ্ছিল মুখটা। কিছুটা সময় চুপচাপ থাকার পর আফাজাদি আবার বলতে শুরু করল, 'তোর বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ আমার থেকে যাচ্ছে। সেদিন কেন তুই আমায় জনাব ব্ল্যাক যখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল তখন গুলিটা ছুঁড়তে দিলি না? এর থেকে আচ্ছা মওকা কী আর হয়? সেদিন গুলি চালালে আজ আমার এই দশা হত না। আজই সকালে আম্মি আমাকে বলেছিল, যাস না বেটা। আম্মির কথা শুনলেই ভালো হত। কিন্তু সবই আমার নসিব।' আবার একটু দম নিয়ে ও বলল, 'মালিক, আমার আম্মিকে একটু দেখিস।'

'দেখব রে, দেখব,' বলতে বলতে ভেঙে পড়ল প্রতাপ। আবার কথা বলতে শুরু করল আফাজাদি, 'আমার গণ্ডারের চামড়ার ঢালটা দোস্ত তিলক খানকে দিস।' এটাই ছিল ওর শেষ ইচ্ছা, এরপর ওর মুখ থেকে আর কোনো শব্দ শোনা যায়নি।

আফাজাদির সব থেকে প্রিয় ছিল এই গন্ডারের চামড়ার ঢাল। এটা নিয়ে ওর গর্ব কিছু কম ছিল না। বাহাদুর লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে টক্কর নিয়ে বাজিমাত করার এটাই ছিল ইনাম। মামুলি কোনো লাঠিয়াল নয়, চর নারান্দির খোদ মানুল্লা সরদারের ভাই — সামনা সামনি টক্কর নেওয়ার সময় ও তাকে সড়কি দিয়ে গেঁথে ফেলেছিল। এই ঘটনাটা ঘটেছিল আগের বছর, যখন প্রতাপ তাকে পাঠিয়েছিল জনাব ডি-এর হুকুমে তার পড়শির চাষ করা নীল জবরদস্তি উঠিয়ে আনার কাজে।

আফাজাদির মৌতের আধাঘণ্টার মধ্যেই আমি হাজির হলাম প্রতাপের বাড়ি। আমাদের ভিতর শর্ত ছিল যে কোনো কিছুই গোপন রাখা চলবে না। কিন্তু শুরুতেই চেষ্টা করা হল সমস্ত ঘটনা চেপে দেওয়ার। আসলে আমি যাতে মোটা রকমের রিশবত না চাই তার জন্য এই চাল। ওরা ভালোই জানত যে প্রতাপ বা তার লোকেদের আমি আদালতে পেশ করব না। সেই সময় পেয়ারের লাঠিয়ালের মৌত হতে দেখে প্রতাপের এতটাই কষ্ট হয়েছিল যে তার লাশটা গায়েব করার কোনো চেষ্টাই সে করেনি। মেঝের উপরই পড়েছিল লাশটা।

প্রতাপ আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'দেখুন, দারোগা সাহেব, দেখুন, ব্ল্যাক আমার এই লোকটাকে খতম করে দিয়েছে, ওই যে লাশটা পড়ে আছে।'

আমি জবাব দিলাম, 'কিন্তু বাবু, তোমার লাঠিয়ালের তো মৌত হয়েছে জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে হামলা চালাতে গিয়ে, এটাই হওয়ার ছিল।'

'এইরকম কথা বলবেন না দারোগা সাহেব, খুন হয়ে যাওয়া ভাতুয়াটার জন্য আমার কলজে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বলুন কী করে এই খুনের বদলা নিতে পারব; এর জন্য যা আপনার লাগবে আমি দেব।'

আমি বললাম, 'ওই তরফও আমাকে এই কাজ করতে বলেছিল, কিন্তু আমি পরিষ্কার না করে দিয়েছি। তুমি বলেই বলছি, তোমরা খুব বেকায়দায় পড়তে চলেছ। তোমার লোকের মৌত হয়েছে তোমারই বাড়িতে। কাজটা একেবারেই ভালো হয়নি। পাকা মামলা খাড়া করতে চাইলে জরুরি ছিল প্রথমেই চোট লাগা লোকটাকে থানায় পাঠানো। নিজের বাড়িতে লাশটা উঠিয়ে এনে সবকিছু তুমি কাঁচিয়ে দিয়েছ। এখন ফরিয়াদিরা বলার সুযোগ পেয়ে যাবে যে তুমি নিজেই তোমার লোককে খুন করেছ।'

একথা আমি অবশ্যই প্রতাপকে বলতে বসিনি যে তার বাড়িতে পৌঁছনোর আগে আমি জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে এত্তেলা করে এসেছি আর সেখানকার

লোকদেরও এই বলে হুমকি দিয়েছি যে প্রতাপ তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করতে চলেছে। লাশটা নিয়ে যেতে দেওয়া যে খুব বেয়াকুফি হয়েছে সেটাও আমি তাদের বলেছিলাম। আসলে আমার ইচ্ছে ছিল মামলাটা যত খারাপভাবে দেখানো যায় তা-ই করা, যাতে তখন তখন একশো রুপিয়া আমদানি হতে পারে। প্রতাপকেও আমি একই কথা বলেছিলাম; আর সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম যে, আমার তরফ থেকে খুনের মামলাটা চাপার জন্য যা-যা চেষ্টা করা দরকার সব জারি থাকবে। জনাব ব্ল্যাকের খাস নোকর, মির সাহেব মামলাটা মিটিয়ে ফেলার এইরকম সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে মালিকের গরহাজিরিতে একটা বড় রকমের ভুলচুক হয়ে গেছে। সে আমাকে একশো রুপিয়া দিলে আমি হুঁশিয়ারির সঙ্গে সেটা বাক্সে ঢুকিয়ে শ্রীরামপুরে রওনা হয়ে গেলাম।

আমি কী বলতে চাইছি প্রতাপ সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। ও জানতে চাইল ওর এখন কী করা দরকার। আমি বললাম, সে নিজেই নিজেকে এইরকম একটা ভয়ানক অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। এখন জরুরি হল দুশমনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা সাজাতে না বসে জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে হামলা করার অভিযোগ থেকে খোদ বাঁচার চেষ্টা করা। এইভাবেই মামলাটা আমার কবজায় এসে পড়েছিল আর যে লিখিত এজাহার আমাকে দেওয়া হয়েছিল সেটাও আমি প্রতাপকে দেখালাম। তবে সেই ইস্তক এজাহারটা ডাইরিতে তুলিনি। ইচ্ছে ছিল, হালতের ফায়দা উঠিয়ে কিছু রোজগার করা আর তাহলে পুরো মামলাটাই চেপে দেওয়া। আমার খেলাটা আমি প্রতাপকে বুঝতে দিইনি। এমন ছল করছিলাম যেন তার যেসব খাস লোকেদের নামে নালিশ রুজু হয়েছে তাদের সঙ্গে মোলাকাত করে তাদের কথা শুনতে চাই। আখেরে প্রতাপও একশো টাকা কবুল করায় আমি আর বেশি দূর এগোলাম না, দু-তরফের অভিযোগ চেপে গেলাম। এর জন্য আমাকে একটা বড় এজাহার বানাতে হল, যেটা ম্যাজিস্ট্রেট হুজুরকে পেশ করব। এজাহারে গ্রামেরই

এক চৌকিদারের নাম করে লিখলাম যে সে-ই আমাকে এত্তেলা করেছিল জনাব ব্ল্যাক আর প্রতাপের ভিতর দাঙ্গা হতে চলেছে। খবর মিলতেই আমি সরেজমিনে যাই আর তখন নজরে আসে যে দু-তরফের জঙ্গবাজরা জমায়েত হয়েছে হাট নিয়ে একটা ঝামেলা বাধায়। তবে শেষপর্যন্ত কোনো মারদাঙ্গা হতে পারেনি। খোদ আমি যেখানে হাজির সেখানে এইরকম কোনো ঝামেলা কি হতে দেওয়া যায়! দরকার পড়লে জান কবুল করে দিতাম। কোনো হাতিয়ারবন্ধ আদমি আমার সামনে এসে পড়লে আমি অবশ্যই তাকে গ্রেফতার করে হাজির করতাম হুজুরের সামনে।

পুরো এজাহারটাই ছিল ভুয়া। যেসব পাঠককে আমি পিছনের ঘটনাগুলো বোঝাতে পেরেছি তাঁরাই অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারবেন। দারোগাদের তরফে এটাকে কোনো খাসঘটনা বলা চলে না। প্রায় সব দারোগাকেই এরকম করতে হয়। আমার কাছে এই ঘটনার সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রতাপেরই বৈঠকখানায় বসে এই এজাহারটা লেখা। আমার চারদিকে ঘিরেছিল সেইসব জঙ্গবাজরা, এজাহারে যাদের সম্বন্ধে লিখেছিলাম নজরে এলেই গ্রেফতার করে হুজুরের সামনে হাজির করব।

আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম থানায়। তারপর আরেকটা এজাহার পাঠালাম হুজুরের কাছে। দাঙ্গা হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই জরুরি সব কামকাজ ফেলে রেখে আমার ওখানে থাকারও কোনো মানে হয় না। আমারই ভরসার এক বরকন্দাজকে আমি চৌকি দিতে রেখে এসেছি। যদি আবার কোনো ঝামেলা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ সে আমাকে খবর করবে।

মামলাটার সুরতহাল খতিয়ে দেখলে দুশো টাকা আমদানিকে খারাপ বলা চলে না। আমার পক্ষে বেশি ভালো হত যদি দুই তরফকেই আরো জড়িয়ে পড়তে দিতাম। কিন্তু আমার নীতি হল অল্প মুনাফা আর চটজলদি আমদানি।

মফস্‌সলি কিস্‌সা

আমার জীবনে সবথেকে ভালো আমদানি হয়েছিল এক দেশি জমিদারের ভাতুয়া পুলিশের উপর সাংঘাতিক হামলা চালালে। ঘটনাটা এতটাই ভয়ানক যে দারোগা কিংবা চাপরাশি তা সে যে-ই হোক সবার মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। থানার দারোগা খুন বলে কথা! অকুস্থলে হাজির ছিলেন খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকা একপাল পুলিশ। এছাড়াও ছিল প্রচুর গ্রামের মানুষ। খুনিদের গ্রেফতার করার জন্য পরে যেসব দারোগাকে সেখানে তলব করা হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের একজন। আমি অবশ্য ছকুকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

সরেজমিনে পৌঁছনোর পরই জানতে পারলাম আসল ঘটনা। দেশি জমিদার আর নীলকর সাহেবের মধ্যে বহুদিন ধরেই চলছিল আকচাআকচি। মাঝে মাঝেই রেওয়াজ মাফিক কাজিয়া বেধে যেত দুই তরফের। এইরকম কাজিয়া মেটানোয় পুলিশের কোনো স্বার্থ নেই। বরং উলটোটাই হল দস্তুর। মানে যত পারো উৎসাহ জুগিয়ে যাও। এইরকম কাজে যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই সে-ও বুঝবে পুলিশ যদি বুদ্ধুর মতো দাঙ্গা, ডাকাতি, বদমাইশি নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে বা ঠেকাতে ছোটে তবে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। ঘটনা ঘটে যেতে দিতে হয় তারপর ফসল ঘরে তোলার মতো সময় আসে উপরি আদায়ের। দাঙ্গা হচ্ছে খবর পেয়ে আমি নিজের কানে আমার হুজুরকে বলতে শুনেছি, 'লড়ে নিতে দাও ওদের তারপর আমি দু-তরফকেই শায়েস্তা করব।' এটাই হল গিয়ে আদত বুদ্ধির কাজ। তাতে যে যা মনে করে করুক। কাজটা হল মাথার ফোড়া পাকলে অস্ত্র করার মতো। কাঁচা থাকতে ঘাঁটাঘাঁটি করে গোলমাল পাকালে উপকার তো হয়ই না বরং বারবার পুঁজ বের হতে থাকে।

এইসব কাজিয়ার লাভ একটাই — আমাদের বড়লোক করা। সে যাক, আমি আমার গল্পটা থেকে সরে যাচ্ছি। নতুন করে কাজিয়া বাধানোর জন্য দু-তরফই তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় জরুরি তলব পেয়ে সাহেবকে ছুটতে হল কলকাতা। কুঠিতে একলা ছেড়ে গেলেন বিবিকে। সাহেব নেই, সেই সময় দুশমনদের তরফে কিছুকিছু কাজকর্ম দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। চিঠি লিখলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে। কুঠির আশপাশে প্রচুর লেঠেলের জমায়েত তাঁর নজরে পড়েছে, সাহেব না-থাকা অবস্থায় তারা হামলা চালাতে পারে বলে ভয়। চিঠি পাওয়া মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর টহলদারি নৌকোয় কয়েকজন বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে হুকুম করলেন কাছাকাছি থানার দারোগাদের। যতজন পারা যায় লোক জড়ো করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ম্যাজিস্ট্রেট রাতেই কুঠিতে এসে হাজির হলেন আর বদনসিব দারোগা তাঁর আগেই সেখানে বহাল হয়েছিল। সকাল হলে ম্যাজিস্ট্রেট সওয়াল জবাব করে কুঠির মালকিনের কাছ থেকে সবকিছু জেনে নিলেন। মেমসাহেব তাঁর স্বামীর ঘোড়াটা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিলেন, যাতে যেখানে জঙ্গবাজরা জমা হয়েছে হুজুর সেখানে যেতে পারেন। আর সেইসঙ্গে সবকিছু নিজের চোখে দেখে বিচারবিবেচনা করতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট হুজুরের চেহারার সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবের বেশ মিল ছিল। তার উপর হুজুর পরেছিলেন তার মতোই শোলার টুপি। কুঠিয়ালের আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হুজুরকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি অন্য লোক। নৌকোয় চেপে রাতে হাজির হওয়ায় কুঠির বাইরে কেউ জানতেই পারেনি যে তিনি সেখানে এসেছেন। ঘোড়ার পিঠে সাহেব, আর পিছনে পিছনে একপাল হাতিয়ারওয়ালা লোক দেখে যারা কাজিয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল তারা ধরেই নিল যে কুঠিয়াল হামলা চালাতে আসছে। আগে থেকে যেমন ঠিক ছিল সেইমতো তারা ঢ্যাঁরা পিটিয়ে হুঁশিয়ারি দিতে লাগল। হুঁশিয়ারি কানে যেতেই যেসব ল্যাঠিয়াল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামগুলোতে ছড়িয়েছিল তারা হাতিয়ার নিয়ে জোট বাঁধল।

ম্যাজিস্ট্রেট এই দঙ্গল আর তাদের হাবভাব দেখে ধরেই নিলেন কুঠিয়ালের বিবি তাঁকে যা-যা বলেছেন সব সত্যি। পুলিশকে তিনি হুকুম দিলেন গ্রেফতার করার। সত্যি বলতে কী এই হুকুম জারির কাজটা একেবারেই বুদ্ধির হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের পল্টনে জনাকুড়ির বেশি লোক ছিল না! হাতিয়ার বলতে জং লাগা তরোয়াল, কোনোমতে খাপ থেকে টেনে বের করতে পারলেও কীভাবে সেগুলো চালাতে হয় জানা নেই। অন্য তরফে পাকা লেঠেলই হবে শ পাঁচেক, তা-ও আবার পাবনা আর ফরিদপুরের, বাংলার এলেমদার জঙ্গবাজ বলেই যাদের ইজ্জত। এদের অনেকেই আবার দাগি বদমাশ, গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই ধরতে পারলে কম-সে-কম সাত থেকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বাঁধা। ওই কজন পুলিশ দেখে ভয় পাওয়ার বান্দাই তারা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট হুজুর সঙ্গে থাকায় বদনসিব দারোগাদের পিছু পিছু যেতেই হল। কোম্পানি বাহাদুরের নামে হাঁক পেড়ে বলতে হল, হাতিয়ার ফেলে দিতে। যেমন চর সব তরফেরই থাকে সেইরকম একজনের কাছ থেকে জমিদার খবর পেলেন যে ঘোড়ায় চড়া লোকটা কুঠিয়াল নয়, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। খবরটা লাঠিয়ালদের কাছে পৌঁছনো মাত্র তারা পিছু হটতে শুরু করল। পুলিশ নিজেদের বাহাদুর ভেবে ধাওয়া করল জঙ্গবাজদের পিছনে। লাঠিয়ালরা ছুটেছিল ফেরি ঘাটের দিকে। শুখা মরসুম হওয়ায় নদীতে জল ছিল কম, জানা থাকলে অনেক জায়গা দিয়ে হেঁটেই পারাপার করা চলে। লাঠিয়ালরা হেঁটেই ওপারে পৌঁছে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির হলেন। নদীটা চওড়ায় খুব বেশি হলে দুশো গজ। ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়াকে পারাপার করানোর মতো নৌকো তখন ঘাটে মজুত ছিল না। তিনি হুকুম দিলেন, ছোট যে নৌকোটা আছে সেটা চড়েই তারা যেন ওপারে যায়। পুলিশ পল্টন হুকুমমতো ওপারে গিয়ে 'পাকড়ো, পাকড়ো' বলে লাঠিয়ালদের ধাওয়া করল। বেনসিব দারোগার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। নাছোড়বান্দার মতো ধাওয়া করে যাওয়ায় বেদম হয়ে পড়েছিল লাঠিয়ালরা। আর তারা বরদাস্ত না করে ঘুরে দাঁড়াল। আল্লা

যাকে শেষ করতে চান তার সব জ্ঞানবুদ্ধি কেড়ে নেন; নাহলে দারোগার কোনো দরকারই ছিল না কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পরেও হঠাৎ করে বলে ওঠা, 'হীরা, ভালো চাস তো চুপচাপ ধরা দে, না হলে বাড়ি গিয়ে তোর বউয়ের ওপর জবরদস্তি করব তোকে ধরিয়ে দিতে।' এই কথা বলা আর মৃত্যু পরোয়ানায় দস্তখত করা যে একই ব্যাপার দারোগা বুঝতে পারেনি। 'ও দারোগা তুই আমাদের চিনিস, তাই না! বহুত আচ্ছা, এবার দিচ্ছি তোর আক্কেল ঘুচিয়ে।' এরপরেই, 'কাট শালাকে — গেঁথে ফেল', হুংকার ছেড়ে একপাল হাতিয়ার সমেত লোক দারোগার দিকে ধেয়ে গেল। নিমেষে উবে গেল কোম্পানি বাহাদুরের তেজ। দারোগা আর বরকন্দাজরা পিঠটান দিল নদীর দিকে। উদ্দেশ্য কোনোমতে নৌকো চেপে প্রাণরক্ষা। ছোটার ব্যাপারে দারোগার থেকে বরকন্দাজদের কেরামতি বেশি বলে তারা আগেই হুড়মুড় করে নৌকো দিল ছেড়ে। দারোগা দেখল যে তার নিজের লোকেরাই তাকে ফেলে কেটে পড়ল। সে পড়ে রইল ওই খ্যাপা লোকগুলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য। দারোগা দেখেছিল লাঠিয়ালদের হেঁটে নদী পার হতে, তাই সে-ও ঝাঁপ দিল জলে। কিন্তু ঠিকঠাক আন্দাজ না থাকায় পড়তে হল গভীর জলে। ডোবার হাত থেকে রক্ষা পেতে তাকে ফিরতে হল সেই পারের দিকেই।

এর মধ্যে লাঠিয়ালরা পৌঁছে গেছে জলের কিনারায়। দারোগাকে লক্ষ্য করে তারা বর্শা ছুঁড়তে শুরু করল, দু-একটা বিঁধল তার গায়ে। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে সে করুণভাবে রেহাই চাইল। হীরাকে ওইরকম বে-আন্দাজি কথা না বললে হয়তো তার কসুর মাপ হত। এবার সেই হীরাই তড়বড় করে জলে নেমে তার মাথা লক্ষ্য করে মারল মুগুরের এক ঘা। খতম হয়ে গেল বেনসিব দারোগার সব আর্জি। লাশটা কয়েকজন দাঙ্গাবাজ টেনে আনল পাড়ের ওপর। যেখানে ঘটনাগুলো ঘটছিল তার ঠিক দুশো গজ দূরে উলটো দিকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেহাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সব কিছু দেখে যেতে হল। যে লোকটা আমাকে নানা খবর জোগাত সে নিজের চোখে পুরো

ঘটনাটা দেখেছিল। বছরখানেক বাদে একবার কথাপ্রসঙ্গে সে বলে যে, সেইসময় তার মনে হয়েছিল, ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে ঘটনাটার বেশ মিল আছে। যেন খতম হতে চলেছিল কোম্পানির হুকুম। জেলার এক নম্বর হুকুমত খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে উপস্থিত, তা-ও আবার ঘোড়ার পিঠে, আদালতে হঠাৎ যিনি কেশে উঠলে সবাই চমকে ওঠে, মনে হয় সিংহ গর্জন করে উঠল — তাঁরই চোখের সামনে কিনা খুন হয়ে গেল তাঁর পল্টনেরই দারোগা। মনে হয় মানুষের যশ-খ্যাতি সবকিছুই নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। লোকটা তখন সেখানে ছিল ঠিকই কিন্তু সে তখন আর হাকিম ছিল না। সেই মুহূর্তে হীরাই ছিল হাকিম। খেপে ওঠা লাঠিয়ালরা দারোগার লাশটা জল থেকে টেনে তুলেই পাগলের মতো নাচতে আর লাফাতে শুরু করল। ম্যাজিস্ট্রেটের বাপবাপান্ত করতে করতে বলতে লাগল, হিম্মত থাকলে সে-ও যেন এগিয়ে আসে। এরপর তারা ঠিক করল লাশটা নিয়ে যাবে জমিদারের কাছারিতে। এর দুটো কারণ ছিল: এক জমিদারের নায়েব বা ম্যানেজারের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতানো — ম্যাজিস্ট্রেটের চোখের সামনে দারোগাকে খুন করে তারা যে হিম্মত দেখিয়েছে এর আগে খোশনাম[১] মানউল্লাহও তা করে দেখাতে পারেনি। আর অন্যটা হল লাশটা গায়েব করা, যাতে তল্লাশি চালু হলে সেটা যেন হাজির করা না যায়; কারণ তাদের ভালোই জানা ছিল যে, এই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। খুনের মামলায় লাশ থাকা না থাকার ফারাক কতটা সে ব্যাপারেও তারা যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিল। ওই দলের সর্দার লাঠিয়ালদের কয়েকজনকে এত বেশি ফৌজদারি মামলায় জড়াতে হয়েছে যে আদালতের অনেক মোক্তারের থেকেও আইনটা তাদের ভালো জানা। লাশ গায়েব করা তাই এতটাই জরুরি হয়ে পড়েছিল। হাকিমের সামনে খুন করলেই বা কী এসে যায় তাতে? সেই হাকিম তো আর মামলার বিচার করতে বসছে না। পালটা একটা মামলা ঠুকে দিলেও চলে যেখানে

---

১. সুখ্যাত

হাকিমকেই বিবাদী বানিয়ে তোলা যাবে, তাহলেই প্রাথমিক তল্লাশির সময় থেকেই মামলাটা চলে যাবে পুরোপুরি হাতের বাইরে।

হাকিমকে হাকিমের জায়গায় রেখে কিছুক্ষণ চলুন যাওয়া যাক দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে জমিদারের কাছারিতে। খুনটা যেখানে হয়েছিল জায়গাটা হল তার থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। রাস্তাটা জমিদারির ভিতর দিয়ে। তাই গা ঢাকা দিয়ে চলার কোনো দরকার পড়েনি। হুংকার ছাড়তে ছাড়তে খোলা মাঠ আর গ্রামের মধ্যে দিয়ে লাশটা হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল লাঠিয়ালরা। গ্রামের মানুষ তাদের দেখতে পেলেই দ্রুত চারদিকে সরে যাচ্ছিল যেন তারা খ্যাপা জানোয়ার। দোস্ত বা দুশমন যে-ই হোক কাজিয়া করে ফেরার পথে লাঠিয়ালদের দেখলে গ্রামের মানুষ এমনটাই করে। তখন তাদের ডাকা হয় 'রণমুখো' বা কেতাবি কথা যুদ্ধমুখী। ছেলে-ছোকরা, যাদের বর্শায় রক্ত লাগেনি তারা, এই অবস্থায় অনেক সময় গ্রামের নির্দোষ কারো উপরেই হয়তো সেটা চালিয়ে দেয়। পাকা লাঠিয়ালদের নজর থাকে দামি মালের দিকে, যেমন পিতলের হাঁড়ি-কলসি। বউ-ঝিদের নাক-কান থেকে গয়না ছিনিয়ে নিতেও তখন আর তাদের বাধে না। এইভাবে কাছারি অবধি গিয়ে তারা দারোগার লাশটা নিয়ে ফেলল নায়েবের বাড়ির চৌকাঠে। নায়েব হল বোষ্টম, জীবহত্যার পাপ থেকে বাঁচতে মাছ পর্যন্ত ছোঁয় না। তায় আবার লোকটা মহা ভিতু, দরজার সামনে লাশ দেখে তার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। হাকিমের সামনে খুন করার কথা শুনে তার বুঝতে বাকি রইল না কী মারাত্মক সর্বনাশ ঘটে গেছে। তার বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে ভয়ে একেবারে একশেষ হয়ে গেল। লাঠিয়ালরা অবশ্য তাকে বুঝিয়ে ছাড়ল যে তক্ষুনি দুটো কাজ করতে হবে — এক তাদের বকেয়া মেটানো আর দুই লাশটা গায়েব করা, যাতে সেটা খুঁজে না পাওয়া যায়। তাদের দাবি ছিল হাজার দুই টাকা। নায়েব সহজে এই পাওনা মেটাতে রাজি ছিল না। সে খুব ভালোই বুঝতে পারছিল যে পাওনাগণ্ডার কাজটা দু-তিন দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলে এই ভয়ানক

ঘটনা নিয়ে এমন শোরগোল বাধবে যে জান বাঁচাতে লেঠেলদের মানে মানে সরে না পড়ে আর উপায় থাকবে না। তাই শুরু হল নানা টালবাহানা। দেওয়ার মতো হাতে থোক টাকা নেই, যেটা আছে পুলিশকে ঘুষ দিতেই চলে যাবে, আরো সাত-সতেরো। নায়েবের ফন্দিফিকির বুঝতে লাঠিয়ালদের এতটুকু সময় লাগল না। এইসব চালাকি অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছিল। লাঠিয়ালরা কাজিয়া ফতে করে এলেই কুঠিয়াল বা অন্যরা তাদের পাওনার হাত থেকে রেহাই পেতে এই খেলা শুরু করত। দরাদরির ফাঁকে কাজিয়ার খবর পৌঁছে দেওয়া হত থানায়। তারপর দারোগা হাজির হলেই লাঠিয়ালরা বাধ্য হত সরে যেতে। নেতা বনে যাওয়া হীরা আর কোনো ওজর শুনতে তৈরি ছিল না। নায়েবের চুলের মুঠি ধরে সে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সেই ঘরে যেখানে সিন্দুক আছে। জোর করে তাকে দিয়ে খোলানো হল সিন্দুক, তারপর সবাই মিলে বের করে নিল কাঁচা টাকাগুলো। পাওনাগণ্ডা চুকে গেলে লাশটাকে ছোট ছোট টুকরো করে গ্রামের কুকুরদের খাওয়ার জন্য কিছুটা ছড়িয়ে দেওয়া হল আর বাকিটা হল পোড়ানো। নায়েবের ঘরে যেসব তামার বাসন আর নেওয়ার মতো ছোটখাটো জিনিস ছিল সেই সব হাতিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে লাঠিয়ালরা ছড়িয়ে পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট হুজুরকে এতক্ষণ নদীর ওপারে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রেখে এসেছি, এবার চলুন তাঁর কাছে যাওয়া যাক। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তাই দেখে তিনি বেহাল হয়ে পড়েছিলেন। চুপচাপ বরকন্দাজদের নিয়ে তিনি কুঠিতে ফিরে এলেন। তাঁর মনে তখন এমন ভয় ঢুকেছে যে না পারছেন ঘোড়ায় চড়ে কাজের জায়গায় ফিরতে, না পারছেন নৌকোতে ফিরতে। অবশ্য নৌকোতে ফেরার প্রশ্নও ছিল না, উজান ঠেলে যেতে হলে কম করে দিন কতক লেগে যেত। তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না তাঁর কী করা দরকার। শেষ পর্যন্ত তিনি যা করলেন এর আগে বাংলার কোনো হাকিম তেমনটা করেছেন বলে জানা নেই। তিনি আশপাশের কুঠিয়ালদের খবর

পাঠালেন তাদের হাতিয়ারবন্ধ ভাতুয়াদের পাঠানোর জন্য। তারা তাঁকে কাজের জায়গায় পাহারা দিয়ে ছেড়ে আসবে। সেটা ছিল কুঠিয়ালদের রমরমার কাল। বছরভর তারা কাজের জন্য লাঠিয়াল পুষত। ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হত নিজেদের অন্যান্য কুঠিতে। কোনো কোনো কুঠিয়াল আর্জি শুনে ভেবে নিলেন এটা হল তাঁকে আর তাঁর লোকজনদের প্যাঁচে ফেলার কায়দা। লাঠিয়াল রাখার বিরুদ্ধে আইন ছিল খুব কড়া। সেই অজুহাতে এই আর্জি অনেকে নামঞ্জুর করে দিলেন। অবশ্য অনেকেই আবার হাকিমের মানও রাখলেন। দেখার মতো দৃশ্য হল একটা, জেলার হাকিম ফিরছেন নিজের কাজের জায়গায়, তাঁকে ঘিরে চলেছে ভয়ানক হাতিয়ারবন্ধ সব খুনে। কয়েকদিনের মধ্যেই লাশ খোঁজার জন্য কয়েকজন দারোগাকে লাগানো হল। আমি আর ছকুই প্রথম সরেজমিনে গেলাম। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই হালহকিকত সব জানা হয়ে গিয়েছিল। এমনকী লাশটার কী গতি হয়েছে সেটাও। আমার মতে, আমাদের আসল ধান্দা হচ্ছে টাকা করা; কে দারোগাকে খুন করেছে, লাশ কোথায় গায়েব করা হয়েছে সেইসব ঝুট ঝামেলায় না জড়ানোই উচিত। আমরা সেইমতো ধান্দায় নেমে পড়লাম। যেসব বাড়ি থেকে আমদানি হতে পারে সেখানে ঢুকে তছনছ করে ছাড়লাম। মালদার লোক মনে হলেই তার আর রেহাই ছিল না। ছকুর হাতে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলপড়ার মতো টাকার বৃষ্টি হতে লাগল। আমরা এ কাজে এমন এলেম দেখিয়েছিলাম যে পরে অন্য দারোগারা যখন হাজির হল তখন গ্রামে আর মানুষজন নেই বললেই চলে।

প্রচুর শোরগোলের পরেও মামলার কোনো কিনারা হল না। উলটোপালটা লোককে দায়রা আদালতে দাখিল করা হল আর শেষে তারা ছাড়াও পেয়ে গেল। আমি, ছকু আর যে কুঠিয়ালকে ঘিরে এতসব কাণ্ড আমরাই কেবল এই তল্লাশি থেকে ফয়দা লুঠলাম। এখান থেকেই কুঠিয়ালের নসিব ফিরল। জমিদার কয়েক বছর সব দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এরই সুযোগ নিয়ে ফয়দা লুঠতে লাগল কুঠিয়াল।

মফস্‌সলের আদালত

আগের পরিচ্ছেদে যে ঘটনার কথা বলেছিলাম সেসব মিটে যাওয়ার পর জনাব ব্ল্যাকের এক ফিরিঙ্গি সাঙাত আমার এক বরকন্দাজকে গুলি করে। আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হল, বরকন্দাজের পায়ে তার ছোঁড়া গুলি সরাসরি বিঁধেছে। এইজন্য কোতোয়ালির সাহেব ডাক্তারকে তার পা কেটে বাদ দিতে হয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল কেমন করে সেটা বলি।

জনাব ব্ল্যাকের গোমস্তা ঈশ্বর ঘোষ এক ফৌজদারি মামলায় আসামি সাব্যস্ত হওয়ায় ফেরার হয়েছিল। পুলিশ তার তল্লাশি চালাচ্ছিল বহুদিন থেকে। একসময় খোঁজ মিলল ফেরারি লুকিয়ে আছে জনাব ব্ল্যাকেরই দূরের একটা কুঠিতে। সেই কুঠির দায়িত্বে ছিল এক ফিরিঙ্গি। পুলিশ তখন প্রতাপ গাঙ্গুলির সাহায্য নিয়ে ঈশ্বর ঘোষকে গ্রেফতারের চেষ্টা শুরু করল।

পুলিশের তরফেও বেশ বজ্জাতি ছিল। এই কাজে প্রতাপের সাহায্য নেওয়ার কোনোই দরকার ছিল না। বিশেষ করে এটা যখন জানা যে, ফেরারি হল তারই এক নম্বর দুশমনের নফর। আর শুধু কী তা-ই প্রতাপের সাহায্য নিয়ে সেই দুশমনেরই খাসতালুকে হানা দেওয়া! আমার গরহাজিরির সুযোগে প্রতাপ ছকুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল। আর ওই রিশবতখোর একাই সবটা কামাবে বলে তাড়াহুড়ো করে ঈশ্বর ঘোষের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দিল। পরোয়ানার সবথেকে জরুরি দিকটাই তার নজর এড়িয়ে যায়। শুধু এর জন্যই ফিরিঙ্গিটা বরকন্দাজের উপর গুলি ছুঁড়েও সুপ্রিম কোর্টে বেকসুর খালাস হয়ে গেল, অথচ ওই একই অপরাধে জেলার হাকিম তাকে অপরাধী ঠাউরেছিলেন। ঘটনাটা কী ঘটেছিল বলা যাক।

আগে যে ফিরিঙ্গির কথা বলছিলাম এবার থেকে তাকে জনাব শার্প

বলে ডাকব। একদিন সকালে সে দেখল জনা পঞ্চাশেক হাতিয়ারবন্ধ লোক তার কুঠির দিকে আসছে; সে ধরেই নিল লোকগুলো প্রতাপের লাঠিয়াল। উদ্দেশ্য কুঠিতে হামলা চালানো। নিজের দোনলা বন্দুকটা বাগিয়ে সে তৈরি হল; ভালো করে গেদে নিল ছররা, তারপর হাঁক পেড়ে যতজনকে জড়ো করা যায় জড়ো করল। নিজে গিয়ে খাড়া হল দরজার সামনে। ইচ্ছে — হামলাবাজদের মজা টের পাওয়ানো।

জনাব শার্পের সঙ্গে রিস্তা ছিল কলকাতার এক দাপুটে ব্যবসায়ী পরিবারের। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মুকদ্দমা শুরু হলে এই রিস্তা অনেক কাজ দিয়েছিল। যেসব জুরি তার বিচার করবে, তাদের বেশির ভাগই কোনো-না-কোনো ভাবে এই পরিবারটার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওদিকে রেস খেলুড়ে হওয়ার সুবাদে জনাব ব্ল্যাক মুকদ্দমা নিয়ে চড়া দরে বাজি হাঁকতে শুরু করল, দুয়ে এক থেকে শুরু করে পঁচিশে এক — জনাব শার্প রেহাই পাবে কি পাবে না নিয়ে বাজি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরার লোক পাওয়া যায়নি। মুকদ্দমা মিটে গেলে ব্ল্যাক বলেছিল, একশোতে এক দর দিতেও সে রাজি ছিল। কারণ শার্প বলে কাউকে যে জুরিরা দোষী সাব্যস্ত করবে না সেই ব্যাপারে সে ছিল পুরোপুরি নিশ্চিত। তার কথাই হয়তো ঠিক। এই নিয়ে বেশি বলার মতো এলেম আমার নেই। তবে এই মামলায় জুরিদের দোষ আমার নজরে পড়ে না, কেন পড়ে না সেটাই বলব।

আবার আমাদের গল্পে ফিরে যাই চলুন। হাতিয়ারবন্ধ লোকগুলোকে পথ দেখিয়ে আনছিল লালপাগড়ি বাঁধা একটা লোক। জনাব শার্প বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। একটা হুংকার আর সেইসঙ্গে শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ। লালপাগড়ি আঁটা লোকটা চিত হয়ে পড়ে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল, 'দোহাই কোম্পানি বাহাদুর, আমাকে খুন করে ফেললে।' এর মধ্যেই দুশমনেরা ময়দান খালি করে সরে পড়েছিল, তাই জনাব শার্প চিত হয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই তার ভয় ধরে গেল,

লোকটার কাপড়ে আঁটা তকমা জানান দিচ্ছে যে সে পুলিশের বরকন্দাজ। যে পরোয়ানার জোরে সে তল্লাশি চালাতে হাজির হয়েছিল, সেটা মাটিতে তার পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। সেটা পড়ে জানা গেল ঈশ্বর ঘোষের মামলার বিবাদীদের বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা, কিন্তু সেখানে নির্দিষ্ট করে কারো নামের উল্লেখ নেই।

জনাব শার্প ছিল লড়াকু লোক, কোনো উকিল নয়। পরোয়ানাটা দেখেও সে বুঝে উঠতে পারল না সেটা তার কোন কাজে লাগতে পারে। প্রতাপের লাঠিয়াল ভেবে সে সরকারি কর্মচারীর উপর গুলি ছুঁড়েছে এই ভয়টাই তার বুদ্ধিশুদ্ধি তখন গুলিয়ে দিয়েছিল।

ছররা লেগে লোকটার হাঁটুর নীচের হাড় একেবারে চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। তার দেখভালের পাশাপাশি তাড়াহুড়ো করে লোক পাঠানো হল জনাব ব্ল্যাকের কাছে।

খবর পেয়েই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জনাব ব্ল্যাক এসে হাজির। এই ঘটনায় সে যে খুশি নয় সেটা তাকে দেখেই মালুম হচ্ছিল। চোট খাওয়া লোকটাকে ভালোমতো তজবিজ[১] করে সে আরো বেজার হয়ে পড়ল। তবে গ্রেফতারি পরোয়ানাটা খুঁটিয়ে পড়তে পড়তেই তার মেজাজ খুশ হয়ে উঠল। ব্ল্যাক বলল, জনাব শার্প বরকন্দাজটার সঙ্গে ঠিক কাজই করেছে। তারপর হুকুম দিল, 'লোকটাকে ডুলিতে তুলে থানায় পৌঁছে দে।'

'চলো হে,' বলে শার্পের দিকে ঘুরে বলল, 'এক পাত্তর বিয়ার খাওয়া যাক।' তারপর দুজন গিয়ে ঢুকল বাংলোতে। শার্পের মাথায় আসছিল না কী করে এত তাড়াতাড়ি লোকটার মেজাজ পালটে গেল। তাই সে জানতে চাইল কারণটা।

জনাব ব্ল্যাক জবাব দিল, 'এই থানার লোকগুলো আস্ত গাধা, ওদের বেকুবির জন্যই আমরা বেঁচে যাব। চোট পাওয়া বরকন্দাজটা দারোগার

১. পরীক্ষা করে দেখা

কাছে এজাহার না দেওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে থাকব। বেশক লোকটা বলবে, সে পরোয়ানা নিয়ে ঈশ্বর ঘোষকে গ্রেফতার করতে আসছিল আর তুমি তার ওপর গুলি ছুঁড়েছ বা ঈশ্বর ঘোষকে গ্রেফতার করার পর ছুঁড়েছ। প্রতাপের লোকেরা যে ওর সঙ্গে ছিল সেই কথাটা ও চেপে যাবে। তাহলেই বোঝো। পরোয়ানাটা আমি ভালো করে পড়েছি, ঈশ্বর ঘোষের নাম সেখানে কোথাও নেই। আসলে এটা একটা মামুলি পরোয়ানা, ঠিক করে বলা নেই কাকে গ্রেফতার করতে হবে। তার জোরেই তুমি সুপ্রিম কোর্টে বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। তবে এর জন্য উকিলকে ভালোরকম আজুরা[১] দিতে হবে। আমার বন্ধু ব্যারিস্টার লংবিল শার্ককে তোমার জন্য বহাল করব, আজ রাতেই ওকে চিঠি দিচ্ছি। তোমাকেও ভালোরকম ফ্যাসাদে পড়তে হবে, হাকিম পুলিশের হেপাজতে তোমায় পাঠাবে কলকাতায়। এর আর কোনো সুরাহা নেই। ভেবে দেখো তুমি যদি বরকন্দাজটাকে গুলি না করতে আর ওরা ঈশ্বর ঘোষকে গ্রেফতার করত তাহলে ফেরার সময় প্রতাপের লোকগুলো অবশ্যই কুঠিতে হামলা চালাত আর সেইসঙ্গে তোমাকেও মজা বুঝিয়ে ছাড়ত।'

চোট খাওয়া বরকন্দাজটা থানায় পৌঁছে ঠিক সেইরকম এজাহার দিল যেমন জনাব ব্ল্যাক আন্দাজ করেছিল। এতে আমি খুশিই হলাম, কারণ আমি সাফ দেখতে পাচ্ছিলাম এইরকম একটা মামলায় জনাব ব্ল্যাক রিশবত দেওয়া নিয়ে কোনো বাহানা করবে না। আমার মাথায় কেবল ঘুরছিল আমদানির অঙ্কটা। বেয়াকুব ছকু যে পরোয়ানায় কোনো নাম বসায়নি সেটা আমার খেয়ালই ছিল না। তার থেকেও বড় কথা হল যাকে গ্রেফতার করতে যাওয়া হচ্ছে তার নামই বাদ। এইরকম একটা গাফিলতির কারণ অন্তত আর যা-ই হোক নসিব নয়। বেশক[২] এর কারণ গাঁজা। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি

১. মজুরি, পারিশ্রমিক
২. নিঃসন্দেহ

যে, এর জন্য আমার লোকসান হয়েছিল এক হাজার টাকা। লোকসান বলছি কারণ কারবারটা ঠিকমতো চালু হলে ওই টাকা আমি হাসিল করেই ছাড়তাম।

চোট খাওয়া বরকন্দাজের জবানবন্দি নেওয়া হলে তাকে পাঠানো হল কোতোয়ালির ডাক্তারের কাছে। পা কেটে বাদ না দিলে তাকে যে বাঁচানো যাবে না সেটাই সেখানে সাব্যস্ত হল। জনাব শার্প বিচারের জন্য আত্মসমর্পণ করলে তাকে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো হল আর সময়মতো সে পেল বেকসুর খালাস। ব্যারিস্টার জনাব লংবিল শার্ক মফস্‌সলের জীবন আর স্বাধীনতার বিপদ নিয়ে দারুণ ভাষণ দিল। বলল, সেখানে পুলিশ কর্তারা তাদের মর্জিমাফিক কাউকে দোষী বানিয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এই সুযোগে কালাকানুন নামঞ্জুর করার জন্যও সে ইংরেজ প্রজাদের একচোট বাহবা দিল। একবার ওইরকম কানুন জারি হলে মফস্‌সলের আদালতের মতো আদালতের দয়ার উপর নির্ভর করতে হত ইংরেজদের।

জনাব শার্পের দোস্তরা আদালতের বাইরে তাকে মুবারক জানাবে বলে অপেক্ষা করছিল। আর জনাব ব্ল্যাক এই খুশির দিনে সবাইকে নিয়ে চলল উইলসনে খানাপিনা করতে।

আরেকবার জনাব ব্ল্যাকের অন্য এক সহকারী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, তবে এই লোকটা ইংরেজ ছিল না, ছিল ফ্রান্স বা আমেরিকার দো-আঁশলা পরদেশি। এই ঘটনা থেকেও আমার ভালো আমদানি হয়। লোকটার নাম জনাব এল। পাক্কা বজ্জাত। অল্পদিনেই দুজন দুজনকে চিনে নিয়ে ভালো দোস্ত হয়ে গেলাম। সে ছিল জনাব ব্ল্যাকের এক নম্বর শাকরেদ, খুব ভালো লোক চিনত, চৌকস, আর হুঁশিয়ার; তবে ভালোবাসত হাঙ্গামা করতে। হাঙ্গামা-হুজ্জতে জড়িয়ে পড়লেই সে খোশ মেজাজে থাকত। তার এইসব হাঙ্গামার জন্য নিশ্চয় জনাব ব্ল্যাকের ভালোই খরচ হত। জনাব এল-এর দাঙ্গাবাজির ঝোঁক মালিকের যে খুব একটা অপছন্দ ছিল তা-ও না, কারণ সে ছিল জনাব ব্ল্যাকের খুবই পেয়ারের লোক। অনেকদিন ধরেই সে নানা

দাঙ্গায় জয় হাসিল করে আসছিল। এর জন্য তাকে কোনো বড় ঝামেলাতেও পড়তে হয়নি। দরকার হলেই আমাদের রিশবত দিত, অবশ্যই খুব সহজে নয়। কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন একটা ঝামেলায় জড়াল যার থেকে আমি প্রচুর আমদানি করি। দাঙ্গাবাজ জনাব এল সুযোগ পেলেই প্রতাপের সঙ্গে নিজের লোকেদের লড়িয়ে দিত। এইসব কাজিয়ায় নিজেই নেতা হত বলে দুশমনদের নাস্তানাবুদ করাটা সহজ হয়ে যেত। এইরকম কোনো এক কাজিয়ায়, জনাব এল যেখানে নেতা, একটা লোক খুন হল। লোকটা যে কোন তরফের সেটা চেনাই হয়ে পড়ল মুশকিল। কারণ, লোকটার মুণ্ডুই লোপাট হয়ে গিয়েছিল। এটাই দস্তুর। কাজিয়া করতে গিয়ে কেউ খুন হলে তার মাথা লোপাট হয়ে যেত। পুলিশ কোনোভাবে লাশের সন্ধান পেলেও মুণ্ডু ছাড়া ধড় শনাক্ত করার কাজটা কঠিন হয়ে পড়ত। তার ওপর দুই তরফেরই সুযোগ থাকত হলফ করে বলার যে লাশটা সেই তরফের।

জনাব এল একটা মামলা রুজু করল প্রতাপের বিরুদ্ধে। জনা ছয়-সাত আমিন বা খালাসির সঙ্গে সে যখন ঘোড়ায় চেপে নীলের খেত দেখতে যাচ্ছিল সেই সময় আচমকা প্রতাপের লোকেরা তাদের ওপর হামলা চালায়। যে লোকটা খুন হয় সে তারই আমিন। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হলে জনাব এল কবুল করে, মুর্দা লোকটা আসলে প্রতাপের দলের, কাজিয়ার সময় তাদেরই একজনের হাতে সে খুন হয়।

এই গল্পের তল করা আইনের সাধ্যের বাইরে। দুই তরফের ইশাদিরাই[১] হলফ করে লাশটা তাদের লোক বলে শনাক্ত করছিল। ঘটনার যেমন কোনো সুরাহা হল না তেমন জনাব এল-কেও দাঙ্গার অভিযোগে বা খুনের দায়ে দায়রা আদালতে হাকিমের সামনে হাজির করা গেল না।

এটা ভাবতে আমার ভালোই লাগছে যে বিচারের সময় আমি জনাব এল-কে সরাসরি মদত জুগিয়েছিলাম। সেইসময় মৌলভি বা বিচারক দায়রা

---

১. সাক্ষী

আদালতের রায়ের ভিত্তিতেই অভিযুক্ত দোষী না নির্দোষ সেই ফতোয়া দিতেন। যে মৌলভি তার বিচার করতে বসবেন তাঁকে আমি ভালোমতো চিনতাম আর সেইসঙ্গে এটাও জানা ছিল যে বড় অঙ্কের কিছু নিতে তাঁর আপত্তি হয় না। মৌলভির সঙ্গে হাজার টাকায় রফা হল। জনাব এল-এর মামলায় ফতোয়া দেওয়ার সময় তিনি বলবেন সে বেগুনাহ্[১]। জনাব এল-এর বিচার শুরু হলে দেখে কারো বোঝার জো ছিল না, গম্ভীর মুখ আর লম্বা দাড়িওয়ালা যে মৌলভি বেঞ্চির উপর গ্যাঁট হয়ে বসে তাঁকে আসামি আগেই ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছে। বিচারের নামে চলছিল তামাশা। ফতোয়া মোতাবেক হাকিম আসামিকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। সবথেকে বড় তামাশা হল হাকিম খালাসের রায় দেওয়ার সময় ওই মৌলভির দাড়ি চুমড়ে বলা, ওয়াজিব! ওয়াজিব! এই তাজ্জব ঘটনা থেকে আমার কোনো নীতি শিক্ষা হয়নি। উলটে আমি আরো বেশি করে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে পুরো দুনিয়াটাই বেইনসাফিতে[২] ভরা। বিচারকের আসনে বসা মৌলভি যদি রিশবত নিতে পারেন তবে পঁচিশ টাকা মাস মাইনের দারোগা সেই কাজ করলে কোথায় গুনাহ্!

আদালতের প্রতিটা দপ্তরে যে রিশবতের বন্দোবস্ত চালু তার কতটুকু খবর রাখেন আমাদের রাজাবাদশারা! দেওয়ানি আদালতের হালচাল আমার ততটা জানা নেই। আমি কেবল খবর রাখি ফৌজদারি আদালতের। সাচ্চা মুসলমানের ইমানের কসম, অন্তত আমার সময়ে একজন হাকিম বাদে আর সবাই ঘুষ নিত। এই বন্দোবস্ত রোখার চেষ্টা কোনো কোনো হাকিম যে করেননি তা-ও না। একজনের কথা বলতে পারি যিনি নিজের আমলার খবরদারি বন্ধ করতে সবসময় হুঁশিয়ার থাকতেন। এমনকী আদালত চলার সময় পেশকার কিছু বোঝাতে চাইলেও কমই তাকে মুখ খোলার সুযোগ দিতেন।

১. নির্দোষ
২. অবিচার

হুজুর বুঝতে পারছেন না এমন শক্ত কোনো বাংলা কথা বোঝাতে গেলেও তাকে থামিয়ে দিতেন কড়া ধমক দিয়ে। আরেকজন হাকিম তো সবসময় আমলার দিকে নজর রাখতেন। খেয়াল করতেন সে কোন তরফের পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা করছে। কোনোভাবে বুঝলেই চলে যেতেন তার উলটোদিকে। আমলাও কায়দাটা বুঝে গেলে তাদের আমদানি বেড়ে যায়। তাদের ইচ্ছেমতো তখন তারা নিজেদের পছন্দের মামলাগুলো জিতিয়ে দিতে পারত। ঠিক সময়ে কায়দামাফিক এমন সব নজির পেশ করত বা ফিকির করত সেই তরফের পক্ষে, যাদের তারা আসলে হারাতে চায়। হুজুর এমন ভাব করতেন যেন কিছুই তাঁর নজরে পড়ছে না, মনে মনে তিনি তাদের এইসব তদবির, তোযামোদকে বেপাত্তা করে দিতেন। কী করেই বা তিনি জানবেন এগুলো হল আমলাদের ফিকির! না বুঝেই তাই জিতিয়ে দিতেন তাদের মক্কেলদের। এককথায় সব চেষ্টাই বেকার। ভারতের আদালতে ঘুষ বন্ধ হওয়ার নয়। আমআদমি বিশ্বাসই করবে না যাদের হাতে মামলা আছে তাদের রিশবত না দিলে সাচ্চা বিচার বা আইন মেলে। তারা যে খুব ভুল ভাবে তা-ও না। হাকিম যতটা করতে পারেন সবসময়ই তার থেকে অনেক বেশি কাজ তাঁর হাতে থাকে। তাঁদের না আছে সময় না আছে ইচ্ছে। দু-একটা মুকদ্দমাতেই তাঁরা কেবল তাঁদের মুনশিয়ানা দেখান। হেলাফেলা করে এজাহার নেওয়া হয়, আগেই একটা কিছু ধরে নিয়ে সেইমতো রায় বের হয়। মুকদ্দমায় জিত হয় তাদের, যাদের সঙ্গে আমলাদের বেশি খাতির। মুকদ্দমা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে না এতেই হাকিম খুশি। এখনকার মতো একজনের জন্য তিনজন হাকিম থাকলে অবস্থার সামান্য কিছু হেরফের ঘটে আর ঘটে হাকিম যদি নিজে ইংরেজিতে জবানবন্দি নেন। যা বুঝি না তা-ই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি দেখছি বেএক্তিয়ার হয়ে যাচ্ছি। আদালতের আইনকানুন কেমন করে শোধরানো হবে তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, আমার বলার কথা ততটাই যা আমি নিজে দেখেছি। এইসব ঘটনা ছিল আজ থেকে বিশ বছর

আগের। এখন শুনেছি হাল কিছুটা ফিরেছে। যত হাকিমের দরকার তত হাকিম নেই ঠিকই, তবে আইনমোতাবেক ইশাদির জবানবন্দি নেওয়ার কথা তাঁদেরই। আমি আশা করব, যে-কোনো মুকদ্দমাতেই তাঁরা যেন এই কাজটা নিজেরা করেন। আমার আমলে জবানবন্দি লেখার জন্য মুহুরিরা একটাকা করে দস্তুরি নিত। ফরিয়াদিরা দেখত এতে তাদের কাজটা ভালো হয়। ইশাদিদের দিয়ে বলানোর মতো কঠিন কাজ এতে অনেক সহজ হয়ে যায়। যে মুহুরি এজাহার লিখবে সে নিজের কাজটা ভালোই বুঝত, এজলাসের একধারে শুধু তার সঙ্গে ইশাদিকে বসতে হত। তারপর নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স আর বিড়বিড় করে যা সে বলে যেত তা কেবল মালুম করতে পারত সেই এজাহার লিখনেওয়ালাই। লেখার কাজ খতম করে হাকিম যেখানে আয়েশ করছেন সেখানে জোরে জোরে একঘেয়ে সুরে পেশকার তাঁকে সেইসব পড়ে শোনাত। ইশাদিকে যদি কখনো জিজ্ঞেস করা হত সেটাই তার জবানবন্দি কিনা, তাহলে অবশ্যই তাকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখা যেত। হাকিমও আর দেরি না করে একেবারে তাকে রেহাই করে দিতেন। আদালতে আসামির কোনোভাবেই ইশাদিকে চোখে দেখার বা পরখ করার সুযোগ হত না। মামলায় কিছু প্রমাণ করার থাকলে আসামির বিরুদ্ধে হয় শমন বা পরোয়ানা যেমনটা দরকার জারি করা হত। সে-ও তখন নিজেকে আদালতের সামনে পেশ করে দায়ের করত তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব। ইশাদিদের নাম কবুল করত। তারাও আবার ফরিয়াদি পক্ষের মতোই এজাহার দিত, সবটাই একে অন্যের গরহাজিরিতে। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত পাকা হত মামলা। আল্লা ছাড়া মামলার সত্যি-মিথ্যে বিচার করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ইশাদিরা সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে এজাহার দিত, কোনো ভুলচুক ছাড়া। কোনো তরফেরই সওয়াল জবাব হত না। মামলার ফয়সলা হয়ে থাকত বহুদিন আগেই। হাকিমের এই ব্যাপারে কিছুই আর মনে থাকত না, কেমন করেই বা থাকবে? হয়তো যখন তিনি খুব ব্যস্ত তখনই আসামি, ফরিয়াদি, ইশাদিরা

ভিড়ে ঠাসা ঘরে তাঁর সামনে দিয়ে কেবল এসেছে গেছে। যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে যে আসামি এটুকুই শুধু তিনি বুঝতেন।

এঁইবার শুরু হত ঘুষের খেলা। আমলাকে যদি ঠিকঠাক খাওয়ানো হয়ে থাকে আর তার যদি হাকিমের উপর কিছু প্রভাব থেকে থাকে তাহলে দায়সারা ভাব দেখিয়ে সে বলে বসবে হয় ফরিয়াদির সঙ্গে ইশাদির যোগসাজস আছে না হয় হুজুরের খারিজ করা গত বছরের কোনো মামলায় এই একই লোককে এজাহার দিতে দেখা গিয়েছিল।

ভরসা করার মতো সাক্ষীসাবুদ নেই এই অজুহাত পেয়ে হুজুরও খুশি হয়ে ওঠেন আর মামলাও যায় খারিজ হয়ে।

বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে আমলা দুই তরফেরই টাকা খেয়ে বসে আছে। তখন বেচারা হাকিম পড়ে যান ধন্দে। আমার বোনাই ফকিরের কাছে শোনা সেই পুরনো কায়দাটাই নিশ্চয় তাঁরা তখন কাজে লাগান।এক ইজ্জতদার হাকিম এইরকম সব প্যাঁচালো মামলায় ডিক্রি দেবেন না খারিজ করবেন বুঝতে না পারলে, জেবের দুই পকেটে দুই টুকরো মিছরি কাগজে মুড়ে নিয়ে আসতেন। একটা আসামির, একটা ফরিয়াদির। পেশকার যখন তাঁকে মামলাটা পড়ে শোনাত সেই সময় তিনি চুপচাপ মিছরি দুটো সামনে বার করে রেখে দিতেন। তারপর আসামির মিছরির ডেলা বা ফরিয়াদির মিছরির ডেলা যেটার উপর প্রথম মাছি বসত, পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিতেন।

আশা করি আল্লাও চাইতেন মাছিটা ঠিক মিছরির ডেলার উপরই বসুক। সওয়াল একটাই, যদি সাচ্চা বিচার পাওয়ার জন্য কোনো ঘুষ দিতে বা বজ্জাতি করতে না হয় তাহলে তামাম বাংলার লোক কি খুশি হয়ে তা মেনে নিতে পারবে? আমার বিশ্বাস তারা পারবে না। বেশক এরা হল দারুণ হুঁশিয়ার আর ফেরেব্বাজ জাত। ঠিক-বেঠিক নিয়ে এদের কোনো সাফ সাফ ভাবনাই নেই, আখেরে কী লাভ হচ্ছে সেটাই বড় কথা আর তার জন্য এরা

সবকিছু করতে রাজি। কোনো কিছু হাসিল করতে পথ যত বাঁকা হবে বাহবাও তত বেশি। ফৌজদারি আর দেওয়ানি আইন হল এদের কাছে জুয়ার টেবিল, ঘোড়দৌড়ের মাঠ বা কমসে কম ফিরিঙ্গিদের জঙ্গের ময়দানের মতো। নিশানায় পৌঁছোনোর জন্য এরা এদের ধনদৌলত বরবাদ করতেও রাজি। তখন আর তাদের ইমান-ধরম নিয়ে মাথাব্যথাও থাকে না। যে মামলাবাজ যত বেশি ঘুষ দিতে পারবে আর ফেরেব্বাজি করতে পারবে তার তত বেশি কদর। আদালতে তাদের মতলব হাসিল করার উপায় বন্ধ হয়ে গেলে দেখা যেত আর কোনো মাতামাতিই নেই। সরকারেরও তখন বড় রকমের লোকসান হত। মামলা করা কমে গেলে স্ট্যাম্প কাগজের বিক্রিও কমে যেত অর্ধেক।

প্যাঁচপয়জারে মফস্‌সল

জনাব ব্ল্যাক আর প্রতাপবাবুর কাজিয়া বড় সাহেবদের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা হাকিমকে আদেশ দিলেন পুরো পুলিশ পল্টন নিয়ে যেখানে রোজ রোজ হাঙ্গামা হচ্ছে সেখানে থানা গাড়তে। যে তরফই বেয়াদবি করুক, ধরতে পারলে তাদের যেন কঠিন সাজা হয়। এদের কারণে হুকুমতের বেইজ্জতির একশেষ হচ্ছে।

আদেশ পেয়েই হাকিম চলে এলেন আর তারপরের দিনই জনাব ব্ল্যাকের কুঠিতে কতজন জঙ্গবাজ মজুদ সেটা যাচাই করতে সেখানে হাজির হলেন। ভাবখানা এমন যেন জনাব ব্ল্যাক তাঁর আসার কোনো খবরই রাখে না আর তাঁকে দেখানোর জন্য সে তার লোকজনদের রেখে দেবে। আমাকেও তখন হুজুরের সঙ্গে যেতে হয়েছিল। কুঠিতে পৌঁছোনো মাত্র জনাব ব্ল্যাক হুজুরের খাতিরদারি শুরু করে দিল। আধ ঘণ্টা যেতে-না-যেতেই নজরে এল, হুজুর তার আদবকায়দা আর সহবতে মশগুল হয়ে পড়েছেন। দরকারে এইরকম কেরামতি জনাব ব্ল্যাক আরো অনেকের সঙ্গেই করেছে বলে শুনেছি। কুঠিতে কুলি, সহিস, খিদমতগার আর নোকররা ছাড়া আর কারো খোঁজ মিলল না। হুজুর এতে খুশিই হলেন। তাঁর সঙ্গে তখন জনাব ব্ল্যাকের দহরম মহরম বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে রাতের খানার সময় হয়ে গেল। তিনি চললেন জনাব ব্ল্যাকের সঙ্গে খানা খেতে। তাঁরা তখন এমন খোশগল্পে মত্ত যে মনেই হয় না কোনো কাজে আসা হয়েছে। আমারও অনুমতি মিলল খানা খেয়ে আসার।

দুই সাহেব তো কুঠির দিকে হাঁটা দিল। সেইসঙ্গে দেখলাম আরেক ফৌজি কর্তাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারপর তিনজন বারান্দায় পায়চারি

করতে করতে মেতে উঠল খোশগল্পে। পাশেই একটা ঘরে লাগানো হয়েছিল খানার টেবিল। সাহেবরা খেতে বসবে ঠিক সেই সময় নজরে পড়ল, একদল লোক কাঁধের উপর খাটিয়া করে একটা কিছু কুঠির দিকে বয়ে নিয়ে আসছে। হুজুর আমাকে হুকুম করলেন ব্যাপারটা কী জেনে আমি যেন জলদি জলদি তাঁকে জানাই। আমাকে আর এত্তেলা করতে হল না তার আগেই লোকগুলো হাজির হয়ে গেল। হাকিম দাঁড়িয়ে, বারান্দায় তাঁর পায়ের সামনে নামিয়ে রাখা হয়েছে খাটিয়াটা, তার ওপর পড়ে আছে কাদায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া একটা লাশ। শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া লাশটা দেখলে মনে হয় লোকটার ফৌত হয়ে গেছে ঘণ্টা কয়েক আগেই। ঝামেলাটা ভালোমতোই পাকিয়ে উঠল। জনাব ব্ল্যাকের উপর নারাজ হয়ে উঠলেন হুজুর। খানা পড়ে রইল, আমার উপর হুকুম হল মুহুরিকে খবর দেওয়ার। সে যেন কাগজ-কলম নিয়ে হাজির হয়। উদ্দেশ্য তাঁর সামনেই ইশাদিদের জবানবন্দি লিখিয়ে নেওয়া।

'দয়া করুন হুজুর,' চিৎকার করে উঠল লোকগুলো, 'আমরা ইনসাফ চাই, এই গরিব যখন পুকুরে মাছ ধরছিল তখন জনাব ব্ল্যাকের লাঠিয়ালরা ওকে খুন করেছে।'

এই ঘটনা শুনে জনাব ব্ল্যাক গম্ভীর হয়ে গেল। তার মাথায় আসছিল না কী করে এইসব হল, যখন তার আর প্রতাপের মধ্যে কয়েকদিন কোনো কাজিয়াই হয়নি। তার ওপর যে যেখানেই থাকুক-না-কেন তামাম লোককে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল যতদিন হাকিম সাহেব মফস্‌সলে থাকবেন ততদিন তারা যেন বুঝেসুঝে চলে। এতকিছুর পরেও তারা খুন করে বসল আর লাশটাকে বয়ে আনতে দিল হাকিমের সামনে; পুরোটাই খুব আজব ঠেকছিল তার কাছে। তখন আর কিছুই করার ছিল না, সামনে পড়ে আছে লাশ, লোকেরা ইনসাফের জন্য চিৎকার করছে। হুজুর জনাব ব্ল্যাকের দিকে কড়া নজর ফিরিয়ে বললেন, 'এইরকম একটা ঘটনা আমি কিন্তু আশা করিনি, আপনার লোকেরা যে আমার সামনে এইরকম স্পর্ধা দেখাতে পারে সেটাও

আমার জানা ছিল না। আমি আশা করব আপনার যেসব লোক এই খুনের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত তাদের আপনি আমার সামনে হাজির করবেন।'

জনাব ব্ল্যাক জবাব দিল, 'আপনি আমাকে এইটুকু বিশ্বাস করতে পারেন যে, অন্যায় যে-ই করে থাকুক তার পিছনে আমার সায় বা উসকানি ছিল না।'

বেজার মুখে হুজুর জানালেন, 'আমিও সেটাই আশা করি।' ব্যস! বন্ধ হয়ে গেল সব কথাবার্তা। মুহুরি আর আমি বসে গেলাম জনাব ব্ল্যাকের বারান্দায় ইশাদিদের জবানবন্দি নিতে।

লাশ সমেত খাটিয়াটা পড়েছিল বারান্দার ঠিক নীচে। একদিকে পায়চারি করছিলেন হুজুর, অন্যদিকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল জনাব ব্ল্যাক। খানা পড়ে পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল।

যে ফৌজি কর্তার কথা আগে বলেছি সে কেবল একবার ঘরের বাইরে একবার ভিতরে যাওয়া আসা করছিল। এই জনাবের নাম কাপ্তান এস। লেখার কাজ শুরু করতে যাব দেখলাম জনাব এস গিয়ে দাঁড়িয়েছে খাটিয়ার সামনে। তারপর ঝুঁকে পড়ে লাশটার নাড়ি আর কলজে পরখ করেই ঝটপট গিয়ে ঢুকল নাস্তা ঘরে। তারপর যখন বেরিয়ে এল তখন তার একটা হাত পাতলুনের জেবে ভরা। সে লাশটার কাছে গিয়ে একটা কিছু ঠেকিয়ে ধরল, ঠিক যেন জাদুডান্ডা। 'হুজুর লাশ ভাগছে, ভাগছে।' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল অনেকগুলো বরকন্দাজ, দারুণ শোরগোল শুরু হল। যাকে এতক্ষণ লাশ ভাবা হচ্ছিল সে এমন দৌড় দিল যে তার পিছনে ধেয়ে যাওয়া লোকগুলোও তখন বেহাল। সবটা এত আচমকা হওয়ায় আমরা একেবারে তাজ্জব। কী হল বুঝতে বুঝতেই লোকটা নাগালের বাইরে চলে গেল। কয়েকজন বরকন্দাজ বহু কসরতের পরেও তাকে গ্রেফতার করতে পারল না।

এই ঘটনার জেরেই জনাব ব্ল্যাকের বরাত খুলে গেল। তার সঙ্গে দুশমনির এত বড় প্রমাণ পেয়ে হাকিম এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে ওঠা যে-কোনো মামলাই খারিজ করে দিতেন, তা সে সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক। জনাব ব্ল্যাকও সুযোগের পুরো ফয়দা ওঠাতে লাগল। প্রায় হুজুরের চোখের সামনেই অবাধে চলতে লাগল প্রতাপের গ্রামগুলোতে লুঠতরাজ। জনাব ব্ল্যাকের লোকেরা গাঁয়ে গাঁয়ে গুজব ছড়াল হাকিম সাহেব নাকি তাদের মালিকের রিস্তেদার। তিনিই সায় দিচ্ছেন এইসব কাজ করতে — লক্ষ্য প্রতাপকে সহবত শেখানো আর তাদের মালিককে খুশি করা।

ঘটনা যে কী সেসব আমার ভালোই জানা, লোকেদের কাছে খোলসা করারও কোনো দায় নেই। খোদ হুজুরের সঙ্গেই যখন জনাব ব্ল্যাকের এত দহরম-মহরম তখন আমি কেন বেকার তার সঙ্গে দুশমনি করতে যাব। তবে দেখা গেল জনাব ব্ল্যাকের কাছ থেকে আমাদের আমদানি খুব তাড়াতাড়ি কমতে শুরু করেছে। মতলববাজ ব্ল্যাকের আমাদের সঙ্গে আর দরাজ হওয়ার দরকার ছিল না। আমাদের দিয়ে যা হত সেটা খোদ হাকিমই করে দিচ্ছেন। সেই সময় হাকিম প্রতাপবাবুর বিরুদ্ধে থাকায় আমরাও বাধ্য হতাম তার কাছ থেকে দুগুণ উশুল করতে। তবে এই কাজ যে আমি খুব খুশি হয়ে করেছি তা-ও না। ভিতরে ভিতরে আমি সবসময়ই জনাব ব্ল্যাকের থেকে প্রতাপবাবুকেই বেশি পছন্দ করতাম। যে-কোনো সাচ্চা মুসলমানই একজন ফিরিঙ্গির থেকে বেশি পছন্দ করবে একজন হিন্দুকে। কিন্তু আমিই বা কী করি, আমাদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে! প্রায় বছরভর চলল এই হাল। প্রতি সপ্তাহেই জনাব ব্ল্যাকের লোকেরা লুঠ করতে লাগল প্রতাপের গ্রাম, সঙ্গে থাকত পুলিশ। অজুহাত কোনো ভয়ানক বজ্জাতকে গ্রেফতারের কাজে তারা আমাদের সাহায্য করছে। সেই বজ্জাতটা নাকি ফেরার হয়ে আছে এইসব কোনো গ্রামে। জনাব ব্ল্যাক রোজই বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন নতুন পরোয়ানা হাকিমকে দিয়ে জারি করাত।

ব্ল্যাকের খাস লোক মির সাহেব আমাকে যে একটা মজাদার কিস্‌সা শুনিয়েছিল। তারপর থেকেই আমি তার ঠান্ডা দিমাগের কদর করা শুরু করি।

জনাব ব্ল্যাকের এজেন্ট মেসার্স রিসকল অ্যান্ড কোম্পানি একবার একজনকে তার কাছে পাঠায় নীলের ব্যবসা শিখতে। গর্ডন বলে স্কটল্যান্ডের এই নওজোয়ান ছিল সাচ্চা ইনসান আর সেই সঙ্গে হিম্মতি। দু-একটা দেশি বুলি বলতে পারলেও তখনকার মফস্‌সলের প্যাঁচ-পয়জারে ছিল একেবারে আনকোরা। জনাব ব্ল্যাক সঙ্গে করে তাকে একদিন তার লুঠের সফরে নিয়ে চলল। তাকে বলা হল, প্রতাপ হুমকি দিয়েছে গ্রাম লুঠ করবে, সেটা ঠেকাতেই এই সফর। বেচারা গর্ডন বন্দুক বাগিয়ে টাট্টুতে চেপে বেরিয়ে পড়ল ব্ল্যাক আর তার লুঠেরাদের সঙ্গে। জায়গায় পৌঁছোলে ব্ল্যাকের দলবল তো ঢুকে গেল গ্রামে। আর গর্ডন বুঝল, প্রতাপ বলেছে এই গ্রামেই হামলা চালাবে। তাকে একদিকে রেখে জনাব ব্ল্যাক চলে গেল অন্যদিকে, বলে গেল দুশমনরা এলে সে যেন তাদের ঠেকায়। বহুক্ষণ টহলদারির পরেও গর্ডন কোনো হানাদারকে দেখতে পেল না। গ্রামের ভিতর থেকে কেবলই শোনা যেতে লাগল হই-হল্লার আওয়াজ। তারপর তার নজরে পড়ল জনাব ব্ল্যাকের লোকেরাই ঘরগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে তাদের কাপড়ের বান্ডিল, পিতলের লোটা আর অন্যান্য আসবাব। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে গর্ডন তাদেরই একজনকে ডাকল। অনেক জবরদস্তির পর জানা গেল গ্রামের জমিদার আসলে প্রতাপ আর লুঠতরাজ করছে জনাব ব্ল্যাকের লোকরা। তার কাজ হল সেইসব লুঠেরাদের রক্ষা করা। সবটা শুনে তার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তড়িঘড়ি সে ছুটল ব্ল্যাকের কাছে এর ফয়সলা করতে। দেখা হওয়ার পরে তাদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল তা এইরকম:

গর্ডন : আমি শুনলাম প্রতাপের হামলা রুখতে আমরা যে গ্রামটাতে এসেছি সেটা আসলে প্রতাপেরই, আর হামলা চালাচ্ছি আমরা,

কথাটা কি সত্যি?

জনাব ব্ল্যাক : জরুর।

গর্ডন : তা হলে বলতে হয় আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। আমাকে এইসবের মধ্যে জড়ানোর আগে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না? আমি এসেছিলাম নীল তৈরির কায়দা শিখতে, লুঠতরাজ করতে নয়।

জনাব ব্ল্যাক : তুমি এসেছিলে কেমন করে নীলের ব্যবসা সামলাতে হয় তার তালিম নিতে, আজ যেটা দেখলে সেটা তারই একটা অংশ।

দেখা গেল জনাব গর্ডনের নীলকুঠির একজন দক্ষ ম্যানেজার হওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই। সে পত্রপাঠ একটা নৌকো ভাড়া করে পরের দিন কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

মওকা পেয়ে একবার প্রতাপও পুরো খেলাটা জনাব ব্ল্যাকের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল। যে হাকিম প্রতাপের উপর খাপ্পা ছিলেন তিনি কয়েক মাস ছুটি কাটাতে গেলে তাঁর জায়গায় অল্প মেয়াদে বহাল হলেন এক নতুন হাকিম। প্রতাপের এক নম্বর মাতব্বর চন্দ্র দত্ত ভাবল আরেকবার জনাব ব্ল্যাকের লোকেদের মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়ে কিসমত পরখ করা যাক। এই ব্যাপারে শলাপরামর্শ দিতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। এমনকী সবরকম সাহায্য করতেও তৈরি ছিলাম। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই আমাকে এই কাজ করতে হচ্ছিল। এর মধ্যে আমি কোনো গুনাহ খুঁজে পাই না। নিজেকে বাঁচানোর কথা খোদ কোম্পানি বাহাদুরের কানুনই বলে। সাফ জাহির হয়ে পড়েছিল যে হাকিমদের সঙ্গে জনাব ব্ল্যাকের দহরম-মহরমই তাকে আমাদের হাত থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। সে ভুলেও আর আমাদের দিকে নজর ফেরায় না। যে টাকাটা আমরা তার কাছ থেকে হাসিল করে থাকি তাতে এমন ঘাটতি দেখা দিল যে নিজের হিস্‌সাটা নিতেও তখন লজ্জা হত। এটাও ঠিক যে, এই ঘাটতি আমরা উশুল করতাম প্রতাপের কাছ

থেকে দু-গুণ নিয়ে। তবে সেখানেও এবার আমদানি কমার ভয় দেখা দিল। আমাদের দু-গুণ ঘুষ কবুল করেও বেচারা প্রতাপ প্রত্যেক মামলায় হেরে যায়। তাই এবার ঘুষের উপযোগিতা নিয়ে তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। এমনকী সে একথাও বলতে শুরু করল যে হাকিমগুলো হচ্ছে আসলে এক-একটা গাধা, মুকদ্দমার সময় তারা দারোগার বয়ানটা পর্যন্ত ভালো করে পড়ে দেখে না। তাই লাগসই রিপোর্ট বানানোর জন্য সে যে টাকা খরচ করে তার সবটাই জলে যায়। এই যখন হাল তখন নিজেদের বাঁচাতে আমি যা করেছিলাম তা আল্লার দরবারে বা মানুষের দরবারে মঞ্জুর হবে বলেই আমার বিশ্বাস। চন্দ্র দত্ত যখন প্রথম আমার কাছে কথাটা পাড়ল তখন আমার মনে হল এই সলাপরামর্শে ছকুর থাকাটাও ভালোই হবে। মামুলি বজ্জাতির কাজ ছাড়াও সলা দেওয়ার ব্যাপারে ছকুর ওস্তাদি কিছু কম ছিল না। চন্দ্র দত্ত তার এক রায়তের সঙ্গে ফন্দি করেছিল যে সে তারই এক লাঠিয়ালকে পাঠাবে ওই রায়তের বাড়ি লুঠ করতে আর সেইসঙ্গে তাকে একটু জখম করে আসবে। রায়ত তারপর তাড়াহুড়ো করে তার বিবিকে থানায় পাঠাবে খবর দিতে যে, সেইদিন ভোর রাতে জনাব ব্ল্যাকের লোকেরা তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে সব লুঠ করে নিয়ে গেছে আর যাওয়ার সময় সড়কি দিয়ে এমন ঘায়েল করেছে তার খসমকে যে, সে বেঁচে আছে না মরেছে তার জানা নেই। পরখ করে দেখার সময়টুকুও তার ছিল না, কোনোমতে খিড়কির দরজা দিয়ে সে পালিয়ে এসেছে থানায় খবরটা দেবে বলে। যে লোকগুলো তার বাড়ি চড়াও হয়েছিল তাদের মধ্যে জনাব বি-এর খাসজমাদার মতি খান ও আরো দুজনকে সে শনাক্ত করতে পেরেছে। বেচারি মেয়েটা যা জানত তার থেকে অনেক বেশি সত্যি কথা বলেছিল, কারণ তার খসম সত্যিই খুন হয়েছিল।

দর কষাকষির সময় ঠিক হয়েছিল জখমটা হবে মামুলি রকমের। আসলে চন্দ্র দত্তর হুকুম ছিল লোকটাকে পুরোপুরি খালাস করার। তার লোকেরা হুকুমমাফিক কাজই করেছিল।

এই গোপন কথাটা চন্দ্র দত্ত আমার কাছে খোলসা করেছিল। কিংবা বলা ভালো ছকুকে ডাকার পর তার পরামর্শ মতোই এই ছক পাকা হয়। ছকু তার জীবনে এইরকম পরামর্শ দেওয়ার কাজ খুব কমই করেছে। মেয়েটার জবানবন্দি লিখে নিয়েই আমি তড়িঘড়ি চললাম সরেজমিনে।

পৌঁছে দেখলাম লাশটা একেবারে কাঠ। মেয়েটাও কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তো সে বুঝতেই পারছিল না কী ঘটে গেছে। তারপরে যখন সে বুঝতে পারল তার খসমের ফৌত হয়েছে তখন এতক্ষণের মিছিমিছি কান্নাটা পালটে গেল বুকফাটা আর্তনাদে। এর মধ্যে চন্দ্র দত্ত আর তার লোকেরাও এসে হাজির, আমাদের তল্লাশির কাজে সাহায্য করবে বলে। মতি খান আর তার দলবলকে অকুস্থলে আচমকাই দেখতে পেয়েছিল এইরকম সাক্ষীও জোগাড় হল। পুরোটাই সাজানো গিয়েছিল খুব সুন্দরভাবে। মামলা প্রমাণ করতেও কোনোই অসুবিধা হয়নি। ফরিয়াদিরা হাকিমের কাছে গেলে তিনি দায়রা আদালতে মামলা করার ভরসা দেন।

দায়রা আদালতের হাকিম মতি খান আর সেইসঙ্গে অন্য দুজনকে দশ বছরের সশ্রম দণ্ডের হুকুম দিলেন। মনে হয় যবে থেকে তিনি হাকিমের কুর্সিতে বসেছেন তবে থেকে এইরকম ভয়ানক খুনের বিচারের সুযোগ তাঁর আর ঘটেনি। আসামিদের অপরাধ ঠিক ঠিক কিনারা করা যায়নি বলেই বোধহয় তিনি মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিতে পারলেন না। আসামিদের মধ্যে যে কে ঠিক খুনটা করেছিল সেই প্রমাণও ছিল না তাঁর হাতে।

ভাগ্য ভালো যে তখনও পেনাল কোড চালু হয়নি। তা নাহলে এত সহজে তারা রেহাই পেত না। সদরে ফরিয়াদের পরেও সাজা বহাল রইল। একজন বিচারক দুঃখের সঙ্গে জানালেন, আসামিরা যে অপরাধের সময় অন্য জায়গায় ছিল সেটা প্রমাণ করতে প্রচুর মিথ্যে বলা হয়েছে। ব্যাপারটা বড়ই বেদনাদায়ক; বিশেষত যেখানে তাদের অপরাধ একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

সদরের রায় শুনে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম দায়রা আদালতের হাকিম তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করবেন আর সদরে তাদের খালাস করে দেওয়া হবে। মুকদ্দমায় সওয়াল জবাবের গুণে যে এরকমটা হয় তা নয়, এটাই হল রীতি। আমাদের জেলার যে-কোনো মামলাই আর্জির পর খারিজ হয়ে যায়, কখনো আইনের কারণে আবার বেশির ভাগ সময়ে কী জন্য, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। হাকিম কেবল জানিয়ে দেন সাক্ষী সাবুদ এতই দুরস্ত যে তাদের বিশ্বাস করা চলে না।

সদরের রায় শুনে ছকু খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে বলল, 'আল্লাহ্ হো আকবর।' তারপর সে চলল তার মনোমতো গুরুর মন্দিরে সোয়া পাঁচসিকের মানত চড়াতে। চড়াবে না-ই বা কেন, এই ধান্দা থেকে তার কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকা আমদানি হয়েছিল যে। এটা হল তার চরিত্রের এক আজব দিক। এমনিতে খরচখরচার ব্যাপারে দিলখোলা হলেও সাধুসন্তদের ভেট চড়াতে হলেই সে দারুণ কঞ্জুসি করা শুরু করত। অথচ তার বিশ্বাস যা কিছু ভালো সব এঁদেরই কারণে।

এই মুকদ্দমার রায় জনাব ব্ল্যাকের পক্ষে একেবারেই ভালো হয়নি। এর ফলে হাকিমদের ওপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যাবে বলে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ব্ল্যাক যখন দেখল জেলার সাহেবদের সমর্থন হাকিমদের পক্ষে এতই প্রবল যে তাঁরা মনে করছেন এই মামলায় কোনো কারচুপি হয়নি, তখন সে-ও গলা মেলাল। জোর গলায় এই জঘন্য জুলুমের নিন্দে করে বেড়াল যা কিনা তারই নোকরদের কীর্তি। জজসাহেবকে একথাও শোনাতে ছাড়ল না যে অপরাধীদের ফাঁসির হুকুম না দিয়ে তিনি মস্ত ভুল করেছেন। সেই সময় কোম্পানির নোকরিতে বহাল ছিল বেশ কিছু আহাম্মক আর বেচারা লোক। আমাদের এই জজ সাহেবও ছিলেন তাদেরই একজন। ওই মামলার রায় ঠিক না বেঠিক সে সব ব্ল্যাককে বোঝাতে তাঁর বেশ কষ্টই হয়েছিল। জজ হিসাবে আইনকানুন তাঁর কিছু কম রপ্ত ছিল না আর

আসামিদেরও তিনি আইন মোতাবেকই সাজা দেন। তবুও তাঁকে বলতে হয়েছিল যে জজেরা কুর্সিতে বসেন আইনের তদারক করার জন্য, আইন তৈরির জন্য নয়। তাঁর কথায় ব্ল্যাক খুবই নাড়া খেয়েছিল আর শেষমেষ তাদের মধ্যে এতটাই দোস্তি হয়ে যায় যে, তিনি ব্ল্যাককে পরের দিন তাঁর বাড়িতে দাওয়াত পর্যন্ত দেন। সদরের আরো কয়েকজন হাকিমের সঙ্গে তার সেখানে দেখা হয়। ব্ল্যাকের আদবকায়দা আর দিলখোলা হাবভাব একদিনেই সে যা হারাতে বসেছিল উলটে তা-ও জয় করে নিল।

ওপরের এই ঘটনা মির সাহেবের কাছে ঠিক যেমন যেমন শুনেছিলাম সেইমতো পেশ করলাম। এর মধ্যে যদি কোনো ভুলচুক থেকে থাকে তবে সেটা তাঁর গাফিলতি, আমার নয়। অবশ্য আমি তাঁকে কখনো বাজে কথা বলতে শুনিনি।

কোনো সন্দেহ নেই জনাব ব্ল্যাক ভিতরে ভিতরে চন্দ্র দত্তের ওপর বদলা নেওয়ার জন্য ফুঁসছিল; তবে আমি যতদিন থানায় বহাল ছিলাম ততদিন সে কিছু করতে পারেনি। পরে কিছু করে থাকলেও আমার জানা নেই। আমার নিজের বলার কথাও ফুরিয়ে এল। আমার ভাগ্যও বুলন্দিতে গিয়ে ঠেকেছিল। এবার তার অস্ত যাওয়ার পালা। এর পরে সে কথাই বলব। দারোগার সুদিন খুব বেশি সময় থাকে না, এটাই হল রীতি। আমার বেলাতেও তার রকমফের হল না।

আমার কপাল পুড়ল

আমাদের মধ্যে একটা কথার চল আছে যে, এই দুনিয়ায় যা-কিছু পালটায় তার মধ্যে সব থেকে তাড়াতাড়ি পালটায় দারোগার কিসমত। কারণটা বেইমানির রোজগার। রোয়াব সে দেখাতে পারে অল্পসময়। যে জাদুর গুণে একদিন ধনদৌলত তার হাতে এসে পড়েছিল সেই একই জাদুতে সেসব গায়েব হয়ে যায় নিমেষে। দারোগা তার পরিবারের জন্য ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে পারছে, নিদেন পক্ষে তার ইন্তেকালের পর তারা দুধেভাতে আছে এমন কথা কেউ বলবে না।

আমার ভাগ্যও ডুবতে বসেছিল। বোনাই ফকিরের কাছ থেকে চিঠি এল, বোনের ইন্তেকাল হয়েছে। খবরটা দুঃখের ঠিকই, তবে বোনের ওপর আমার এত বেশি টান ছিল না যে হায় হায় করতে বসব; যেটা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি তা হল, বোন চলে যাওয়া মানে আমার মুরুব্বি না থাকা। সে বেঁচে থাকলে আমি চাকরিতে কোথায় গিয়ে শেষ করতাম জানি না। হাকিম সাহেব একদিন জজ হতেন, কেউ কি বলতে পারে আমিও তাঁর ভরসায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতাম না? শুনেছি বহু হাকিমের খিদমতগারই ওই অবধি পৌঁছেছে। শুরুতেই আমাকে সদরের হাকিম না বানিয়ে মুনসেফও করতে পারতেন। আজীবন মুনসেফ হয়ে থাকাটা অবশ্য আমার ঠিক বরদাস্ত হত না। দারোগা থেকে শুরু করাটা ছিল অনেক বেশি লাভের; তবে সদরের আমিন মানেই একটা আলাদা ইজ্জত। লেখাপড়া যে জানি না তার জন্য কোনো ভয় ছিল না; কে কতটা জানে তা হদিশ করার ইচ্ছে কোনো খেয়ালি জজসাহেবের হতেই পারে, তবে সদরের আমিনকে তার কুর্সি থেকে নড়ানোটাও কোনো সহজ কাজ হত না। কাজে বেমানান হলে তাকে জেলা

থেকে জেলায় বারবার বদলি করা হবে, তবে গিয়ে কোম্পানি বাহাদুর তার ব্যাপারে কোনো ফয়সলা করবে। কোম্পানি বাহাদুরের ফয়সলা মানে নোকরিতে ছুটি আর সেই সঙ্গে পেনশন। কেউ যদি চায় তবে এই সময়ের মধ্যেই সে তার কিসমত পালটে ফেলতে পারে। আমার যে তেমন কোনো সুযোগ আসেনি সে তো জানা কথা! সুযোগ এলে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম আমার হুজুরকে বেইজ্জত হতে দেব না। তিনি যেমন আমার কিসমত গড়ে তোলার জন্য এতটা সময় বরবাদ করছেন আমিও তেমন দু-চারবার ভালোমতো হাতিয়ে নিতে পারলেই সব ছেড়ে আজাদ হয়ে যেতাম।

ফকিরের চিঠি আমার সমস্ত খোয়াবের ইতি করে দিল। লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেলাম (এক সন্ধ্যায় রাবণের কথা থানার মুহুরি নব চক্রবর্তী আমাদের পড়ে শুনিয়েছিল) দূরদেশে রামের জন্মের কথা রাবণের জানা ছিল না। তবে তাঁর জন্ম হলে কেঁপে উঠেছিল রাবণের সিংহাসন, খসে পড়েছিল মাথার মুকুট। আমার না আছে তখ্‌ত, না আছে তাজ। তবুও বোনের ইন্তেকালের খবরে মনে হল পায়ের নীচের জমি কাঁপতে শুরু করেছে। দিন কয়েক পরে থানায় ফকির এলে এই দুঃখ আরো বাড়ল। শুনলাম তার হুজুর হাকিম সাহেবের দূরে কোনো জেলায় বদলির হুকুম হয়েছে। সে এবার তাঁর সঙ্গে যাবে কি না ঠিক করে উঠতে পারছে না। ইদানীং হুজুরের মেজাজও পালটে গেছে, হরদমই তাকে বুড়ো আর বুদ্ধু বলে গালিগালাজ শুনতে হয়, যেরকমটা আগে কখনো হয়নি। সে তাই ছুটি নিয়ে এসেছে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। আমি বললাম, কোনোমতেই জেলা ছেড়ে নড়া চলবে না। হুজুর বদলি হলে হবেন, দরকার হলে সে অন্য হাকিমের কাছে নোকরির উমেদারি করবে। বোন যেখানে আর নেই সেখানে আমাদের সম্পর্ক না থাকারই কথা। তবুও পুরনো খাতিরের সুবাদেই আমরা একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিলাম। জেলার কোনো জজ বা হাকিমের কাছে চাকরি জুটে গেলে আমিও সদর দপ্তরের ভরসার কথা ভাবতে পারতাম।

কিন্তু আমার তকদিরে অন্য কথা লেখা ছিল।

ফকিরের হুজুর জেলা ছেড়ে যাওয়ার আগে তাকে জবাব দিয়ে গেলেন। জজ আর হাকিম দুজনেরই শাদি হয়ে গিয়েছিল। তাদের বিবিরা আমার বোনাইয়ের হালচাল নিয়ে এত আজব আজব কথা শুনেছিল যে সাফসাফ জানিয়ে দিল তাকে নোকরিতে বহাল রাখা চলবে না। বেচারি ফকিরকে তাই ফিরে যেতে হল ঘরে। চাকরি করে যতটুকু বাঁচাতে পেরেছিল তাই দিয়ে শুরু করল আনাজের কারবার। সেসবও বেশিদিন টিকল না। আফশোস নিয়েই তার মওত হল।

সদরে এমন কেউ রইল না যে আমাকে ভরসা দেয়। হাকিমের খাস আমলারা আমার পুরো মাসের মাইনে খেলেও আমার হেপাজত করবে এমন ভরসা ছিল না। আমি কাজে বহাল রইলাম কি রইলাম না তাতে তাদের কিছু এসে যেত না। নতুন করে যে দারোগাই বহাল হোক তাকেও চাকরিতে টিকে থাকতে হলে ওই একই কাজ করতে হত। উলটোদিকে আমায় বরখাস্ত করা হলে আখেরে লাভ হত আমলাদেরই। এইরকম রদবদল হলে দারোগাগিরির জন্য জুটে যেত প্রচুর উমেদার আর সুযোগ মিলত দু-হাতে কামানোর। আমার হেপাজতের জন্য যখন ফকিরই আর রইল না তখন আমি যে আর আগের মতো বেপরোয়া কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারব না এই হুঁশটুকু থাকা উচিত ছিল। আসলে খোদা যার বিনাশ চান তার চোখের রোশনিই কেড়ে নেন। আমারও তখন সেই হাল। একজনের কথা আমার ভাবনাতেই আসেনি। কুদরতের খেল দেখুন, যে আমার এত ভালো দোস্ত, কতবার কতভাবে টাকা কামানোর পথ বাতলে দিয়েছে, তাকেই কিনা আমার কেয়ামতের জন্য তিনি বেছে নিলেন। লোকটার নাম ঈশান রায়, খুব চালাক আর হুঁশিয়ার। জমিদার আর নীলের কুঠিয়ালদের মোক্তারি করাই ছিল তার পেশা। দারোগার চাকরির কড়া শর্ত ছিল এইসব লোকেদের থানার চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরঘুর করতে না দেওয়া। এদের অবশ্য সেরকম কিছু করার দরকার পড়ত না। জমিদার বা

কুঠিয়ালরা কোনো বড় রকমের হুজ্জতে জড়িয়ে পড়লে, হাকিমের কাছে এজাহার পাঠানোর আগে থানার লোকেরা এদের সঙ্গে বসেই ঠিক করত পাওনাগণ্ডা কত হবে। পুলিশ যে এজাহারটা হাকিমের কাছে পাঠাবে তারই নকল এই মামলায় যুক্ত লোকেদের কাছে পৌঁছে যেত এদের মারফত। মামলার গুরুত্ব আর তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া লোকেদের বিপদের পরিমাণের উপর নির্ভর করত পড়তা। মোক্তার কড়ার করে নিত এই লেনদেনের শতকরা দশ ভাগ তার। নকল বেচে যে লেনদেন হত তার উপর হক থাকত থানার মুহুরির। কোনো ইজ্জতদার দারোগাই তার সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারায় যেতে চাইবে না। কোনো কোনো সময় এমন হত যে মামলাটা খুবই সঙ্গিন। মামলায় যারা যুক্ত তাদেরও পয়সার অভাব নেই, নকলের লেনদেনেও ভালো আমদানি হতে পারে। এরকম অবস্থায় খোদ দারোগাকেই দেখা যেত পুরোটা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। মামলার যাবতীয় কাগজ সে তখন ভরে ফেলত নিজের সিন্দুকে। চোস্ত কলমবাজ হলে নিজেই লিখতে বসে যেত এজাহার বা কোনো খাসমুহুরিকে দিয়ে করিয়ে নিত কাজটা। দারোগা এইরকম রেওয়াজ চালু করলে তার সঙ্গে থানার মুহুরির ছাড়াছাড়ি কেউ ঠেকাতে পারত না।

আমাদের মালিক, হুজুর হাকিম সাহেবরা তাঁদের খাসকামরায় বসে পেশকারদের মুখে দারোগার পাঠানো গোপন রিপোর্ট শুনতেন, যাতে আদালতে আর সবাই সেসব জানতে না পারে। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না সেইসব লোকেদের কাছেও রিপোর্টের নকল পৌঁছে গেছে যারা এই মামলায় জড়িয়ে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে থানার মোক্তারকে হেলাফেলা করা চলে না। থানায় রোজ যে বজ্জাতি চলে সেটা সামলানোর জন্য তাকে একই সঙ্গে উকিল আর ফন্দিবাজ হতে হয়। এই রকমটাই ছিল ঈশান রায়। থানার মোক্তারি করা ছাড়াও আমদানির আরো অনেক রাস্তা ছিল। সেটা ছিল হফতম কানুনের রমরমার যুগ। কমিশনারের আমিন চাইলেই বকেয়া খাজনার অজুহাতে অস্থাবর সম্পত্তি কবজা করে বেচে দিতে পারত।

কমিশনারের এই আমিনের সঙ্গেই ছিল ঈশান রায়ের সাঁট। তারই হাত ধরে চলত কারবার। জেলায় নতুন আসা লোকজন, যারা অসুখবিসুখের কারণে বা জলহাওয়া সহ্য না হওয়ার দরুন কিছুদিন থেকেই চলে যেত, তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার মতলবে ঈশান রায় আগাগোড়া ভুয়ো সব মামলা খাড়া করত। এমন সব জমিদার বা রায়তের নামে মামলা আসত যাদের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। এই ভাবে ভুয়ো মামলা সাজিয়ে যেসব জিনিস ক্রোক করা হত তার মধ্যে ছিল ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি, নৌকো ইত্যাদি। আমরাই আবার নামমাত্র দামে বেনামিতে সেসব কিনে নিতাম। পরে এর থেকে প্রচুর মুনাফা হত। জাল মালিক আগেই আদালতের সামনে একটা দরখাস্ত পেশ করত আর সেই সঙ্গে হাকিমকে আর্জি জানাত, তিনি যেন দারোগাকে হুকুম দেন আমিনের ক্রোক করা সম্পত্তি রক্ষা করতে। আর্জি মঞ্জুর হত। কারণ হাকিম কানুন মোতাবেক চলতে বাধ্য ছিলেন। থানার কোনো চাপরাশির হাত দিয়ে হুকুমটা এসে পৌঁছোনো মাত্র ঈশান রায় বুক ফুলিয়ে কাজে নেমে পড়ত। তারপর বেচে দিত সেই সম্পত্তি। মালিক যদি কোনো লোককে সেই সম্পত্তি দেখভালের জন্য রেখে গিয়ে থাকে তাহলে তাকেও শুনিয়ে দেওয়া হত আজগুবি গল্প। শেষ পর্যন্ত তারাও বিশ্বাস করে নিত যে ডিক্রি জারি হওয়ায় সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেছে। তখন তাদের কাজ হত খবরটা মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দু-একবার যে খোদ মালিক খোঁজ-পাত্তা করতে হাজির হয়নি তা-ও নয়, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। কিছুদিন ধরেই এই ব্যবসা বেশ রমরম করে চলছিল। শেষে একদিন একটা বিশাল শালের গুঁড়ি নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় থানার কাছে এসে আটকে গেল। ঈশান রায়ের কাছে এটা ছিল মস্ত পাওনা। সে আর আমি গেলাম গুঁড়িটা দেখতে। ছকুও সঙ্গ ধরল। গুঁড়িটার মালিক কে সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই জেলাতেই থাকে এমন কেউ হলে ঝামেলা হতে পারত। যে লোকেরা কাঠ নিয়ে আসছিল

তাদের কাছ থেকে জানা গেল সেগুলোর মালিক ঢাকার লোক। শুনে ঈশান বলল, তাহলে ঠিক আছে, কোনো হয়রানি হবে না। কাঠের মালিক যে কোনো দেশি লোক তাতে সন্দেহ নেই। এদের জিজ্ঞেস করলে বলবে, মালিক হল ব্রান সাহেব। এটাই এদের রেওয়াজ। এই ব্রান সাহেব যে কে, তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। আসলে এসব বলে এরা পুলিশের জুলুম থেকে রেহাই পেতে চায়। কিংবা মালিকের নামই ভুল বলে। হতে পারে পুরোটাই মনগড়া। আবার এ-ও হতে পারে যে, এই নামটাই সহজে এদের লব্জে আসে। ঈশানের বক্তব্য ছিল, 'লোকগুলো দেখছি ব্রান সাহেবের নাম নিয়ে পুরনো খেলাটাও খেলতে শেখেনি। মনে হয় অনেক দূর থেকে আসছে, কোনো নতুন মহাজনের লোক হবে।'

কিন্তু লোকগুলো যে অন্তত একবার সত্যি কথা বলেছিল সেটা ক্রমশ দেখা যাবে। কাঠের মালিক সত্যিই ঢাকায় থাকত। ব্যাটা বজ্জাত কেবল নীলের কুঠিয়ালই ছিল না, দারোগাদের ফেরেব্বাজির খবরও রাখত। কমিশনারের আমিনদের কারসাজি আর হফতম মামলার নানা প্যাঁচও তার জানা ছিল ভালোই।

ঈশান রায় রেওয়াজ মাফিক এই ধান্দায় লেগে পড়ল। এমন একজন লোককে সে খাড়া করল যার রায়তের খাজনা বাকি পড়েছে, আর এই কাঠের গুঁড়িগুলোও তার। কমিশনারের আমিনকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে একটা হফতমের[১] মামলা রুজু করা হল, যার মধ্যে এই কাঠের ব্যাপারটাও পড়ে। তারপর মওকামাফিক সেইসব বেচা হল আর নামমাত্র দামে বেনামিতে কিনলাম আমি আর ঈশান।

যে লোকগুলো কাঠের হেপাজত করছিল তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এতে তাদের কিছুই যায় আসে না। শুধু তাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিলেই তারা খুশি।

---

১. জমিজিরেত সংক্রান্ত আইন

এই কারবার থেকে আমাদের এত ভালো লাভ হয়েছিল যে নিজেরাই নিজেদের বাহাদুরিতে সাবাস জানতে লাগলাম। বিপদ যে কোন পথ ধরে আসছে সেই চিন্তা আমাদের মাথাতেই আসেনি। আমরা যখন প্রথম গুঁড়িগুলো দেখতে যাই তখন ছকু আমাদের সঙ্গে ছিল। সে আমাদের নিজের লোক বলে কিছুই লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল না। চোর-বদমাশদের মতো থানার লোকেদের মধ্যে একরকম বোঝাপড়া থাকত যে, কোনো অবস্থাতেই কেউ কারো সঙ্গে বেইমানি করবে না।

বেশক শয়তান ছকুটা হল বান্দার বাচ্চা। ওর মধ্যে ইজ্জতের ছিটেফোঁটা নেই। অথচ কোম্পানি বাহাদুরের চাকরি করতে গেলে ওটাই ছিল সবথেকে জরুরি। কাঠ দেখে পছন্দ হলে ও কিছুটা চেয়ে বসল নৌকো বানাবে বলে। আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম কাজটা সে ঠিক করছে না। আমার হকের জিনিস সে কেমন করে চায়। কিছুতেই কিছু হল না। উলটে মাথা গরম করে ছকু আমাকে বলে বসল, এত যে আমি হক ফলাচ্ছি, কাঠগুলো কি আমার আম্মির সুতো কাটার পয়সা থেকে কেনা ? এরপর আর কে-ই বা মাথা ঠিক রাখতে পারে ? আমিও আর-পাঁচটা লোকের মতোই মুখখারাপ করতে শুরু করলাম।

আমার সঙ্গে এই প্রথম ছকু এমন ভাবে কথা বলল। তখনই বোঝা উচিত ছিল বোনের না থাকা আর ফকিরের দাপট চলে যাওয়ায় আমার আর সেই আগের রোয়াব থাকতে পারে না। সেইসব দিন পালটে গেছে যখন আমায় হুজুর ছাড়া ছকু আর কিছু ডাকত না, বর্তে যেত ছিলিম সেজে দিতে পারলে।

কয়েক মাস এই কাঠের মামলা নিয়ে আর কিছু শোনা গেল না। তারপর ঢাকা থেকে একদিন একজন লোক নৌকো চেপে হাজির হল। শুনলাম এই ব্যাপারে সে খোঁজখবর করতে চায়। লোকটা নাকি কাঠের মালিকের একজন ফয়লা। ছকুর সঙ্গে তার খাতির দেখে তাজ্জব হলাম, পরে শুনেছিলাম ছকুই

নাকি অনেক কসরত করে কাঠের মালিকের সন্ধান বার করে, তারপর এই মামলার সব খবর জানিয়ে চিঠি দেয়। কেবল মামলায় জড়িয়ে থাকা লোকেদের নাম সে খোলসা করেনি।

পরে বুঝতে পারি নাম সে বলেনি নিজের আখের গোছাবে বলে। আমাদের কাছ থেকে ভালোরকম টাকা কামানোই ছিল তার লক্ষ্য। যে তাকে ভালোরকম টাকা খাওয়াতে পারবে তাকেই সে ছেড়ে দেবে, নাম-ধাম কিছুই কবুল করবে না। হাকিম এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব কড়া তদন্ত চালালেন, কেবল হফতম আমিন ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনি প্রমাণ মিলল না। আমিন দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেও সদরে খালাস পেয়ে গেল। আমার বা ঈশান রায়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছিল না। কোন জমিদারকে খাজনা মেটানো হয়নি বা কোন রায়ত তার কাছে খাজনা বাকি রেখেছিল এটুকুই শুধু জানা যায়। কাঠগুলো আমি বেনামিতে কিনেছিলাম, তাই কে কিনেছে সেটা বোঝা গেল না।

কাঠগুলো উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমাকে দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত করার মতো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, হাকিম আমার অপরাধ সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে না এই ওজর দেখিয়ে ছকু যে আমার কাছ থেকে কত টাকা হাতিয়েছিল সে কথা বলতেও লজ্জা করে। যতদিন ধরে মোকদ্দমা চলেছিল প্রায় প্রত্যেক দিন আমায় ছকুর মুখ বন্ধ রাখতে টাকা দিতে হয়েছিল। তবুও তার খাঁইয়ের কমতি ছিল না। যত পেত ততই তার খিদে বেড়ে যাচ্ছিল। আমার কিছু বন্ধু তার বেহায়াপনা বন্ধ করতে বলেছিল, কাকেরাও কাকের মাংস খায় না। ছকু তার জবাবে বলে, কাকের মাংস হল কথার কথা, বুড়ি মেয়েছেলের গল্প। সে কাক হলে ভেবে দেখত, যতক্ষণ সে মানুষ ততক্ষণ সে মানুষের মতোই কারবার করবে। আল্লার দোয়ায় যত

পারবে টাকা কামাবে।

শয়তানের বাচ্চা ছকু এইভাবে আমায় শুষেছিল, সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছিল আদালতের আমলা আর মোক্তারগুলোও। বছর দুই ধরে যা কামাতে পেরেছিলাম এইভাবে তার বেশিটাই সাফ হয়ে গেল।

আমার মানইজ্জত, দৌলত সব কিছু চলে গিয়েছিল। এমন কেউ ছিল না যে আমায় ভরসা দেয়। ছকুকে দারোগার ভার সামলাতে দেওয়ায় আমি আরো খেপে উঠলাম। ওর কোনো হক ছিল না দারোগা হওয়ার। মুহুরি নব চক্রবর্তী কাজে বহাল হয় ছকুর অনেক আগেই, কিন্তু সেই সময় নব ছুটিতে ছিল। তা ছাড়া আমার বদলি হিসাবে তার কথা ভাবা যাচ্ছিল না অভিজ্ঞতা কম থাকায়। ছকুকেই বাছা হল কাঠের মামলায় তার ইমানদারির জন্য। এতে যে আমি কতটা দুঃখ পেয়েছিলাম তা বলার নয়। শপথ করেছিলাম এর বদলা আমি ছকুর উপর নেবই। অল্প দিনের মধ্যেই মওকা পেলাম। সেকথা এরপরে বলব।

মাত্র কয়েকবারই আমি জীবনে খুশি হতে পেরেছি। এই ঘটনা যেভাবে শেষ হল তার থেকে খুশি আর কিছুতে হয়েছি বলে মনে করতে পারি না।

মিয়াজানের বদলা

চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি, বাড়ি ফিরে যাব এটা কিছুতেই বরদাস্ত হচ্ছিল না। আমি যে তখন কেবল বেকার তাই নয়, সেইসঙ্গে ফতুরও। হাতে জমানো একটা পয়সা নেই। একদিন যেমন ভেলকির মতো সেসবের আমদানি হয়েছিল, এখন ঠিক সেইভাবেই সব হাওয়া হয়ে গেছে। কী মুখে আর ঘরে ফিরি! জেব খালি, বেইজ্জত, এতদিন ধরে যেসব ইয়ার-দোস্ত আমার চোখ ধাঁধানো কিসমতের নানা গল্প শুনেছে আর আসমানদারি করেছে, কেমন করে আমি তাদের মোকাবিলা করব? আমার সম্পর্কে তাদের এতটাই উঁচু ধারণা যে, আমি যদি বলি আমায় জেলার হাকিম বানানো হয়েছে তাহলেও তারা তাজ্জব হবে না। এখন গিয়ে কিনা আমায় বলতে হবে আমি একজন বরখাস্ত দারোগা, আমার সবকিছু চুরমার হয়ে গেছে! কোনো ইনসানই মনে হয় না তা বরদাস্ত করতে পারবে। আমি তাই ঠিক করলাম ফকির হব। একটা নিরালা বাগানে ডেরা গাড়লাম। জায়গাটা থানা থেকে খুব দূর নয়। নিজের জন্য একটা ছোট্ট কুঁড়ে আর দরগা বানিয়ে জাহির করে নামগান করা শুরু করলাম আল্লার। আমার গলা ছিল জোরদার আর সুরেলা। বহুদূর থেকে তা শোনা যেত। মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশ্বাস খুব চালু যে, এই প্রার্থনার আওয়াজ কানে গেলে ইবলিশ কাছে ঘেঁষে না। কেবল ইমানদারেরাই নয়, ধীরেধীরে হিন্দুরাও বিশ্বাস করতে শুরু করল আমি একজন ওঝা-টোঝা কিছু। রোজই আমার দরগায় আসতে লাগল পুজোর ডালি। দরবেশ-দরবেশ হাবভাব লোকেদের মধ্যে আমার খাতির বাড়িয়ে তুলল। সারাদিন আমি দরগার কাছে একটা গাছের নীচে চুপ করে বসে থাকতাম। চোখ বোজা, যেন আল্লার ভাবনায় মশগুল; কোনো কথা বলি না, জবাবও দিই না। আমি কী ভাবছি

লোকে যদি তা বুঝতে পারত তাহলে দেখতে সেখানে তাদের জন্য প্রার্থনার নামগন্ধ নেই। ছকু আর তার খানদানের ধ্বংসই যে ছিল আমার রোজকার প্রার্থনা সেকথা কেবল জানতেন আল্লা। মানুষ তার মনে মনে কী ভাবনা ভেবে চলেছে সেকথা কী অন্যরা যাচাই করতে পারে? এইভাবেই দিন গুজরান হতে লাগল। ছকুও হাতে ক্ষমতা পেয়ে ইচ্ছেমতো জোরজুলুম চালাতে থাকল থানায়। কিন্তু ওর সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আমার মতো ছকুরও তখন অন্ধের দশা। সরু সুতোয় বাঁধা আইনের খাঁড়া যে ওর মাথার উপর ঝুলছে আর যে-কোনো সময় সেটা ছিঁড়ে পড়তে পারে এটা ওরও নজরে পড়েনি। এই নিয়ে আরো কিছু বলার আগে জানা দরকার থানার জবরদস্তির রকমফের। কারণ, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

রায়তদের হুকুম তামিল করানোর জন্য নীলকুঠিয়ালদের 'রামাকান্ত' আর 'শ্যামাকান্ত'র ব্যবহারের কথা অনেক শোনা যায়। আমিও সেসব শুনেছি তবে কখনো নজরে পড়েনি। হতে পারে এসব বানানো কথা। তবে থানায় যে এসবের ইস্তেমাল হয় সে আমার নিজের চোখে দেখা। এইরকম একটা জিনিস, দেখতে এত মামুলি যে মাটিতে পড়ে থাকলেও কেউ খেয়াল করবে না, তা হচ্ছে এক টুকরো বাঁশ। বড়জোর ইঞ্চি দশেক লম্বা আর ইঞ্চি তিনেক চওড়া। চিরুনির মতো চারটে ফালা করা। ফালাগুলো যাতে টুকরো টুকরো না হয়ে যায় তার জন্য শেষে একটা গাঁট থাকে। কোনো বেয়াদবকে শায়েস্তা করতে হলে তার একটা আঙুল এর মধ্যে ঢুকিয়ে মুখগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় বা হাত দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, যেমনটা সুবিধে। টুকরোগুলো একসঙ্গে চেপে ধরলে কী হবে বুঝতেই পারছেন। এই চাপ সহ্য করার হিম্মত খুব কম লোকেরই থাকে। চোরাই মাল হাসিল করা আর ডাকাতির নিশানা পেতে এই মামুলি দেখতে কলটার কোনো জুড়ি নেই। বাড়িতে আরামে আয়েশে বসে একজন হাকিম জোরজুলুম বন্ধ করার পক্ষে সওয়াল করতেই পারেন। আমার জানতে ইচ্ছে করে এইরকম কায়দা ইস্তেমাল না করলে আমরা

কেমনভাবে ভয়ানক সব অপরাধের সুলুক পাব? বেশিরভাগ মামলাতেই তো কী আসামি কী ফরিয়াদি তরফকে দেখা যায় সবকিছু ঢাকাচাপা দিতে ব্যস্ত। ডাকাতির মামলায় আমাদের একটাই সুযোগ থাকে, যাকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তার পরিবারের কোনো মেয়েছেলেকে ধরে এনে এই কলটা ব্যবহার করা। ডাকাতরাও এটা এত ভালো জানে যে সচরাচর নিজের বাড়ি যে থানার এলাকায় পড়ে সেখানে তারা ডাকাতি করতে চায় না।

এই কায়দা ইস্তেমাল করাটা যে ভুল সেকথা আমি বলি না। গলদটা হল উলটোপালটা ব্যবহারে। ভুল লোকের উপর হয়তো সেটা যাচাই করা হল। ডাকাতদের নাম কবুল করতে চাইছে না বা চোরাই মাল চিনতে চাইছে না, তাড়াহুড়োয় হয়তো তখন বেছে নেওয়া হল ফরিয়াদিকেই। আমরাই বা কী করব, হয়তো ডাকাতি হয়েছে আমাদের থানা এলাকায়, হাকিমের পরোয়ানা এল দশদিনের ভিতর যদি চোরাই মাল আর ডাকাতদের হদিশ করা না যায় তাহলে নোকরি খতম। আমারও হাকিম হুজুরকে সওয়াল করতে ইচ্ছে করে, যদি সরকার তাঁকে হুকুম করত তাঁর জেলায় ঘটে যাওয়া কোনো অপরাধের কিনারা দশ দিনের ভিতর করতে না পারলে তাঁকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে, তাহলে তখন তিনি কী করতেন? তখনও কি তিনি এখনকার মতোই বলতে পারতেন অপরাধের কিনারা করতে আমরা যে আঙুল মোচড়ানোর কায়দা ইস্তেমাল করে থাকি সেটা ভয়ানক, বিশেষ করে তাঁর সামনে যখন আর অন্য উপায় নেই।

থানার জবরদস্তির আরেকটা কায়দা হল 'ঘুরঘুরে' বলে ছোট্ট একটা পোকা। দিনের বেলায় তাকে ঘর থেকে বের করে আনলে সে নিজের জন্য মাটিতে এমন গর্ত খুঁড়বে যে দেখলে তাজ্জব হতে হয়। পোকাটার মুখের দু-ধারে পাখার মতো বেরিয়ে থাকে চোয়ালের শক্ত হাড়। একেবারে করাতের দাঁতের মতো ধারালো। শক্ত থেকে শক্ত জমিতে সে এই দিয়ে নিমেষে গর্ত খুঁড়ে ফেলে।

পোকাটাকে আমাদের কাজে লাগানোর কায়দাটা হচ্ছে: বেয়াদবের জামাকাপড় খুলে, হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে চিত করে শুইয়ে দেওয়া। তারপর তার নাভির ওপর পোকাটাকে রেখে চাপা দেওয়া হয় আধমালা নারকোলের খোলা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তার কাজ। শক্ত জমির বদলে ফুটো হতে থাকে নাভি। বজ্জাতটা যে ফুলের বিছানায় শুয়ে নেই সেটা মালুম হয় তার চিৎকারে।

জুলুম চালানোর এই শেষ কায়দাটা থানার একচেটিয়া নয়। আমি যদ্দূর জানি খাজনা হাসিল করতে জমিদারের কাছারিতেও মাঝেমাঝে এই কায়দার ইস্তেমাল হয়। নীলের কুঠিয়ালদের মধ্যে এর রেওয়াজ আছে বলে শুনিনি। মনে হয় কায়দাটার সুফল তাদের জানা ছিল না।

থানায় আরেক রকমের জুলুম চলে যেটা খুবই নোংরা আর ভয়ানক। যে লোক এই কায়দাটা ফেঁদেছিল বা যারা এর ইস্তেমাল করে তাদের নিয়ে কিছু বলার নেই। এটা একটা সহজ কসরত। কোনো লোককে দুটো বাঁশের মধ্যে ফেলে চাপ দেওয়া। কিন্তু কায়দাটা খুবই খতরনাক। চাপ সবসময় ঠিকঠাক হয় না, তার উপর যাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে তার নেওয়ার ক্ষমতা কতটা সেটাও অজানা। তাই সময় সময় সর্বনাশ ঘটে যায়। এক-দু বার কাজ হাসিল করতে না পেরে আমিও এই কায়দা বাতিল করি।

এই কসরত ছিল ছকুর পছন্দের। গাঁজা টেনে খেপে উঠলে ওর আর অন্য কোনো কায়দার কথা মাথাতেই আসত না। 'ঘুরঘুরে' চাইলেই মেলে না আর রাগের সময় ছকু এক মুহূর্তও বরবাদ করতেও নারাজ। জুলুম চালাতে চালাতে সে বাঁশের উপর লাফিয়ে উঠে জুড়ে দিত খ্যাপার নাচ। মেজাজ ঠিক থাকলে 'ঘুরঘুরে'র কাজের তারিফ করতে কসুর করত না। যার ওপর জুলুম চলছে তার পাশে দাঁড়িয়ে তখন তাকে হাসতেও দেখেছি। যন্ত্রণায় লোকটা যখন কাতরাচ্ছে তখন ছকু বলে চলেছে সোহাগের বুলি, ওরে আমার তোতা; আমার বুলবুল। এই কায়দা খাটাতে পারলে সে এত খুশি

হত যে একবার পোকার জোগান দেওয়ার জন্য একটা ছেলেকেও বহাল করবে বলে ঠিক করে।

আমি মাঝেমাঝেই ছকুকে বলতাম এই বাঁশের কায়দা বাতিল করাই ভালো। বড় ভয়ানক জিনিস। এর জন্য তাকে কোনোদিন বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু আমার কথা সে বেপাত্তা করত। এটা হল ছকুর মেজাজ-মরজির আরেক আজব দিক। তার ধারণা সে যে হামেশাই পির-মুরশিদদের রদ্দি মিঠাই ভেট চড়ায় তার জন্য খোদাতালা তার হেপাজত করছেন। বেপরোয়া কাজের জন্য সে যে কোনোদিন বিপদে পড়তে পারে সেই ভয়টাই তার ছিল না। বেশক এতদিন সে ভালোই চালিয়ে গেছে; বেরহম মেজাজ সত্ত্বেও গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। সে তার খুশ কিসমতের জন্য আল্লার কথা বলত আগেই বলেছি। আমার মনে হয় তার হেপাজত করত আসলে শয়তান! ছকু ছিল শয়তানেরই ছেলে, পিরদের হেপাজতের তার দরকারই ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে এমন একটা ঝামেলায় ফেঁসে যায় যে পির বা শয়তান কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। আমি দারোগা থাকার সময় দিলু বলে এক ছোকরাকে আমার ফাইফরমাশ খাটার জন্য বহাল করি। ছোঁড়ার বাড়ি ছিল আমারই গ্রামে। হাল ফেরাতে সে আর তার মা এসে জুটেছিল আমার কাছে। ছোকরা ছিল এক নম্বরে ছিঁচকে চোর। আমার কাছে কাজ করার সময় সে মাঝেমাঝেই এটা-সেটা হাত সাফাই করত। এর জন্য ওকে সাজাও দিয়েছি। তবে ওর মা-র কথা ভেবে একেবারে দূর করে দিইনি। আমাদের পরিবারের ভরসাতেই ওর মা বেঁচে ছিল। এই দিলু ছিল ছকুর খুবই পেয়ারের। ওর লুচ্চামি আর খেউড় গানই এর কারণ। ছকুর জন্য গাঁজার কল্কে সাজা ছিল ওর কাজ, অন্য বেয়াদবি তো ছিলই, সেইসঙ্গে শিখেছিল গাঁজা টানতে। ছিলিমের শেষে যা পড়ে থাকত সেটাই হত ওর প্রসাদ। আমি বরখাস্ত হলে নিমকহারাম দিলু থেকে গেল ছকুর কাছে। ছিঁচকে চুরির কারণে ছকু যে ওকে মাঝেমাঝেই আচ্ছা করে ধোলাই দিত তার জন্য দিলু দারুণ খাপ্পাও ছিল। ছোকরা জানত

আমার সঙ্গে ছকুর আর খাতির নেই। তাই নানা ছুতোনাতায় সে এসে হাজির হত আমার দরগায়। এখন আমি ফকির, তাই আগে কী হয়েছে তার জন্য ওর ওপর রাগ করতে পারি না। আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আবার খাতির জমে উঠল। ওর কাছ থেকে ছকুর কাজকর্মের খবর পেতে লাগলাম।

দিলুর মালিক যে একদিন ওকে খুন করবে এই বলে আমি মাঝেমাঝে ভয় দেখাতাম। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় পালানো। তবে তার আগে ওর উচিত ছকুর হারামের পয়সা কিছুটা হাতিয়ে নেওয়া। এটাই হবে ওর সঙ্গে ছকুর বেয়াদবির খেসারত। এর মধ্যে কোনো গুনাহ্ নেই। হিন্দুরা এমনিতে নরমসরম জাত, কিন্তু তারা পর্যন্ত কবুল করে যে দুশমনকে শায়েস্তা করার জন্য দরকার হয় 'বল, কল, ছল', মানে মুরদ, ফন্দি আর বেইমানি। দিলু এমনিতেই এত শয়তান যে ওকে দিয়ে কোনো বজ্জাতি করাতে হলে কোরান বা শাস্ত্রের দোহাই পাড়ার দরকার ছিল না।

আমাদের আলাপ-আলোচনা বেকার হয়নি। দিলুর এর থেকে ভালোই ফয়দা হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে ফন্দি আঁটল তার মালিককে লুঠ করে বমাল সমেত সটকানোর। থানার যে ছোট ঘরে চারপাইয়ের উপর ছকু ঘুমোত তার মাথার দিকে একটা বাক্সের মধ্যে ছিল তার টাকাকড়ি। কেবল গাঁজার কল্কে সেজে নিয়ে যাওয়া ছাড়া দিলু কেন, আর কারোরই সেখানে ঢোকার হুকুম ছিল না।

এক রাতে ছকুকে ঘুমোতে দেখে দিলু চুপিসাড়ে বাক্সটা বের করে আনল। দিনের বেলাতেই কোনোভাবে সে চাবিটা সরিয়ে রেখেছিল। অর্ধেক টাকা সরিয়ে বাকিটা আবার সে সাবধানে রেখে এল। প্রথমবার ঠিকঠাক কাজ হাসিল করতে পারায় বেড়ে গেল তার ফুর্তি। দ্বিতীয়বার একই কাজ করতে গিয়ে চৌপাইয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ল ছকুর ওপর। চমকে জেগে উঠে দিলুর চুলের মুঠি চেপে ধরল ছকু। তারপর এমন হাঁকডাক জুড়ে দিল যে মুর্দারও হুঁশ ফিরে আসবে। ডান্ডা হাতে ছুটে এল থানার লোকেরা আর

বমাল সমেত ধরা পড়ে গেল দিলু।

বিছানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ায় দিলুর হাত থেকে পয়সাগুলো চৌপাইয়ের ওপর আর মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো তুলে গুনতি করায় দেখা গেল বাক্সে শ-খানেক টাকা কম পড়ছে। দিলু অবশ্য বলে যাচ্ছিল ঘাটতির কারণ তার জানা নেই (তবে জুলুমের মুখে কবুল করে পয়সা সে-ই সরিয়েছে; বিপাকে পড়ে আমার সাহায্য চাইতে এসে খোদ ছকুই এসব কথা বলে)। পুরো হাল মালুম হওয়ার পর ছকুর রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেল। যে বাঁশের বাখান আগেই করেছি তাই দিয়ে মাঝরাতেই শুরু হল দিলুর উপর জুলুম।

থানার লোকেরা সবসময় দারোগার মর্জিমাফিক চলার জন্য তৈরি থাকে। তবে এবারের ঘটনাকে তারা নিজেদের ব্যাপার বলেই ধরে নিল। থানার বড়কর্তার ঘরে চুরি! এ যে কফন চুরির সামিল। মসজিদ লুঠ হতে দেখলে যেমন মোল্লারা জ্বলে উঠবেন, দিলুর বেয়াদবি দেখে দারোগার খিদমতগারেরা সেইরকম খেপে উঠল।

ছকুর হুকুম এবার তাই অনেক তাড়াতাড়ি তামিল হল। দিলুকে আচ্ছা করে বেঁধে ঢোকানো হল বাঁশের ভিতর। ছকু চিৎকার করে উঠল, 'চাপ দে।' রাগে তখন তার মুখ দিয়ে থুথু ছিটছে, একটু আগেই টেনে এসেছে এক ছিলিম গাঁজা। 'চাপ দিয়ে যা, যতক্ষণ না মুখ দিয়ে আসল কথা বা নাড়িভুঁড়ি না উগরায়।' সে তখন বাঁশের একদিকে উঠে লাফাচ্ছে।

ছোকরা আর চাপ নিতে পারছিল না। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে কবুল করল টাকা সে-ই নিয়েছে, আর তক্ষুনি ফিরিয়ে দিতেও রাজি। কথাটা মুখ থেকে বেরোনো মাত্র, ছকু বাঁশের উপর লাফাবে বলে যে খড়ম পরে ছিল সেটা খুলে মারল দিলুর রগে এক ঘা। ব্যস! খতম হয়ে গেল তার কথা বলা। হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়ায় ছকু ভেবেছিল এটা ভান। চাপ দেওয়া চলতেই থাকল। কিন্তু কোনো ফল হল না। ততক্ষণে দিলু আর জিন্দা নেই। ছেলেটার

জন্য দুঃখ বা এরপর কী ফ্যাসাদে পড়তে হবে সেই চিন্তা তখন ছকুর ছিল না। তার তখন একটাই আফশোস দিলুর কাছ থেকে চোরাই টাকার হদিশ পাওয়ার আগেই তাড়াহুড়ো করে তাকে ঠ্যাঙানো। এখন উপায় বলতে দিলুর মা-কে ধরে এনে আঙুল মুচড়ে হদিশ বার করা।

ছকুর বিচারে, মা-ব্যাটার এতই পীরিত যে শয়তানটা মা-কে না বলে থাকবে না। কিন্তু ছকু এখানে একটা মস্ত ভুল করেছিল। ছোকরার যদি মা-কে গোপন কথা বলার ইচ্ছে থেকেও থাকে, সেই সময় সে পায় নি। দিলুর মা থাকত থানার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ছকু যখন ছেলেকে খুন করে মা-র ওপর জুলুম চালানোর খোয়াব দেখছে তখন লাশটা পড়েছিল তার সামনে। সেই সময় তার একজন পেয়ারের চাপরাশি পরামর্শ দিল অন্য সব ছেড়ে উচিত লাশটার কী গতি করা যায় সেই কথা ভাবা। সদরে লাশটা পাঠানোর কোনো সওয়ালই ওঠে না। যেভাবে ছোকরা মরেছে তাতে আলতুফালতু বয়ান দিলেও রেহাই মেলার উপায় নেই। লাশটার গায়ে ভয়ানক সব নিশান ছড়িয়ে আছে। সাফ নজরে পড়ছে ভাঙা বুক আর পাঁজর। রগের কাছে কাটা জায়গার হাড়টাও ভাঙা বলে বোঝা যাচ্ছে। শেষে ঠিক হল যত জলদি পারা যায় লাশটার গতি করতে হবে আর দিলুর মা-কে বলা হবে তার ছেলে দারোগার টাকা চুরি করে ফেরার। আঙুল প্যাঁচানোর পাশাপাশি তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হবে ছেলের হদিশ বা টাকার খবর না দিতে পারলে তার আর গ্রামে ফেরার দরকার নেই।

সেই রাতেই দিলুর লাশ পুঁতে ফেলা হল একটা কুঁড়ের ভিতর। এটা ছিল ছকুর টাট্টুটার আস্তাবল। লাশ দফন করা হলে জানোয়ারটাকে এনে বেঁধে রাখা হল। ভাবখানা এমন যেন কোনো কিছুই ঘটেনি। পরের দিন সকাল থেকে রেওয়াজমাফিক চলতে লাগল থানার কাজকর্ম।

ছকুর ছোকরা সহিসটা ছিল দিলুর খুব ভালো বন্ধু। আস্তাবলে লাশটা পোঁতার সময় কেউ তার কথা ভাবেনি। পুরো সময়টাই সে ঘরের কোনায়

রাখা খড়ের গাদার উপর ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। আল্লা তাঁর ভাবনাকে কাজে লাগাতে অনেক সময় মামুলির থেকে মামুলি জিনিস ব্যবহার করে থাকেন। এইবার তিনি সেই কাজটা করালেন ছোকরা সহিসকে দিয়ে। আগেই বলেছি, এই ছোকরা ছিল দিলুর জিগরি দোস্ত। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তাই দেখে সে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সব কিছু মিটে গেলে সে ছুটেছিল দিলুর মা-কে খবর দিতে। মাঝরাতে ওই মেয়েটার কান্না শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সে ছুটে এসেছিল আমার পরামর্শ আর সাহায্য নিতে। প্রথমেই আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। তারপর পুরো ঘটনাটা শুনে পরামর্শ দিলাম তখনকার মতো চুপ করে থাকতে। তার ছেলেকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারব না ঠিকই, তবে এই খুনের বদলা আমি নেব।

মেয়েটার ভালোই মনের জোর, আমার কথা বুঝতে তার অসুবিধে হল না। আমার পরামর্শমতো কাজ করতে সে রাজি হল। হাকিমকে একটা বেনামি চিঠি লিখতেই রাতটুকু কেটে যায়। আমি তখনও পর্যন্ত যতটা জানতাম সবটাই খোলাখুলি লিখলাম। ততদিনে আমি এইটুকু লেখার মতো কসরত রপ্ত করে ফেলেছি। আমার আর্জি ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিলুর লাশটা বার করা হোক। পচতে শুরু করার আগেই যাতে শনাক্ত হয়ে যায়। পরের দিন ছোট হাজরিতে বসার আগেই চিঠি পৌঁছে গেল হাকিমের হাতে। আর সন্ধের মধ্যেই তিনি খোদ তল্লাশি চালাতে থানায় হাজির হলেন। পৌঁছেই তিনি প্রথমে ছকুকে জিজ্ঞেস করলেন, দিলু বলে কোনো ছেলেকে কী সে কাজে বহাল করেছিল? যদি করে থাকে, তাহলে তাকে তাঁর সামনে যেন পেশ করা হয়।

আচমকা এইরকম একটা বেয়াড়া সওয়ালের মুখে ছকুর সমস্ত বেপরোয়া ভাব উবে গেল। খামোশ হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে জবাব দিল, ওইরকম একটা ছোকরা তার কাছে কাজ করত ঠিকই, তবে গত রাতে চুরি করে ফেরার হওয়ায় তাকে হুজুরের সামনে পেশ করা যাচ্ছে

না। ছোকরার মা যেহেতু তার সঙ্গে ছিল সে-ও এ-কথার সাক্ষী দেবে।

ছকুর কথা শুনে হাকিম প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর তাকে বললেন, ওই ফেরার ছেলেটার মা-কে হাজির করতে। কিন্তু তার খোঁজ মিলল না। সে তখন আমার ঘরে লুকিয়ে। হাকিমের সন্দেহ তাতে আরো বেড়ে গেল; তিনি সোজা হাঁটা দিলেন আস্তাবলের দিকে। ছকু দেখল সর্বনাশ। ভয়ে তার হাত-পা ঠান্ডা। হাকিম হুকুম দিলেন টাট্টুটাকে সরিয়ে জমির তল্লাশি নেওয়ার। জমি খোঁড়ার জন্য কয়েকজন কুলি ধরে আনা হল আর খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতেই বেরিয়ে এল দিলুর লাশ।

ছকু বলেছিল এসবের কিছুই তার জানা নেই, লাশটা পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারছে না। কিন্তু বললে কী হবে, গ্রেফতার হওয়া সে ঠেকাতে পারল না। লাশটাকেও সঙ্গে সঙ্গে সদরে পাঠানো হল ময়না করতে। হাকিম ফিরে যাওয়ার আগে হুকুম দিয়ে গেলেন, যদি দিলুর মা বা সহিসের খোঁজ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুজনেই তখন আমার ঘরে লুকিয়েছিল। আমি নিজের স্বার্থেই তাদের রেখেছিলাম। কাঠের মামলায় ছকু যে টাকা আমার কাছ থেকে হাতিয়েছিল এদের দিয়ে আমি তার কিছুটা উশুল করতে চাইলাম। ছকুকে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। একজন ফকির হওয়ার সুবাদে আমি কোনোভাবেই একজন ভয়ানক খুনিকে মেহেরবানি করার গুনাহ্ করতে পারি না। আমার আসল মতলব তো ছিল তার সর্বনাশ করা; কিন্তু সেটা এমনভাবে যাতে আমার সঙ্গে সে যা করেছে তার প্রতিশোধও নিতে পারি আবার উচিত শাস্তিও যেন তার হয়। এর জন্য দিলুর মা-র সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়েছিল, সে তার ছেলের লাশটা দেখে না-চেনার ভান করবে ছকু তাকে দুশো টাকা দিলে। এই মামলায় আমার কাজটা কী হবে তা-ও আমি আলাদা করে তাকে বুঝিয়ে রাখি। আস্তাবলের ছেলেটা ছিল আমার তুরুপের তাস। তাকে মজুদ রেখেছিলাম আসল সময়ে খেলাটা মাত করতে। সে-ও ছিল আমারই গ্রামের

আর পুরোপুরি আমার কব্জায়। ছোটখাটো ভুলচুকের জন্য ছকুর জুলুম বরদাস্ত করতে হয়েছে বলে সে-ও ছিল দারুণ খাপ্পা। তাই দিলুর খুনের বদলা নিতে তার উৎসাহের কমতি ছিল না।

বরাতজোরে এমন কতগুলো ঘটনা সেই সময় ঘটে যাতে আমাদের কাজ সহজ হয়ে পড়ল। হাকিম থানা ছেড়ে গেলে ছকুর ফাটকে থাকার কথা, কিন্তু দেখা গেল সে-ও ইচ্ছেমাফিক ঘুরতে পারছে। মামলা নিয়ে কোনো খটকা থাকলে চাকরির জায়গায় এই সুযোগ কর্মচারীরা পেয়ে থাকে। যতক্ষণ বেকসুর প্রমাণ করার সুযোগ তার থাকছে ততক্ষণ এই সুবিধা সে পাবে। আর যদি দেখা যায় সেই সুযোগ নেই তাহলে সব আশকারা বন্ধ। বাইরের লোকের সঙ্গে তখন আর তার কোনো ফারাক করা হবে না। ছকু কোত্থেকে শুনেছিল, দিলুর মা আমার ঘরে লুকিয়ে আছে। আর সে ধরেই নিয়েছিল সহিস ছোঁড়ার গায়েব হওয়ার পিছনেও আছে আমারই কারসাজি। অন্ধকার হলে তাই সে আমার দরগায় হাজির হল। লক্ষ্য, ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেতে আমার মদত। আমিও তারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে তখন যে কথা হয়েছিল তা অনেকটা এইরকম:

ছকু : শাহসাহেব, আমি আপনার খাদেম।

ফকির হওয়ার সুবাদে লোকে এখন আমাকে শাহসাহেব বলেই ডাকত।

মিয়াজান : আলেকুম সেলাম দারোগাসাহেব। আল্লা আপনার হেপাজত করুন। আপনি দয়া করে এখানে হাজির হয়েছেন তার জন্য আমি ধন্য। আমার সৌভাগ্যের কারণ জানতে পারি কি?

ছকু : মহা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি শাহসাহেব। আমাদের পুরনো দোস্তির কথা ভেবে, আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে।

মিয়াজান : বসুন। বসুন, দারোগাজি। বলুন আপনার দুঃখের কথা। আল্লার দোয়ায় আমার যা করার আমি আপনার জন্য করব।

ছকু : আপনি নিশ্চই শুনেছেন থানায় কী হয়েছে! আস্তাবলে কেউ একটা লাশ পুঁতে রেখে গেছে। লোকে বলছে লাশটা দিলুর। সবার সন্দেহ এর পিছনে আমার হাত আছে। এই দরগায় বসে আমি শপথ করতে পারি আপনারই মতো আমিও বেকসুর। লাশটাও কোনোমতেই দিলুর নয়।

মিয়াজান : ছকু সাহেব, এখানে আল্লা থাকেন, যারা তাঁর দোয়া পেতে চায় তাদের উচিত সাফ মন নিয়ে আসা। এটা থানা নয় দারোগাজি। এটা শেখ ফরিদের দরগা। এই মহান পির তিন কাল দেখতে পেতেন। আমারও যে তাঁর মতো এলেম আছে বলছি না, তবে সেই মহান পিরের আশীর্বাদে আমিও পিছনের ঘটনা অনেকটাই দেখতে পাই। আমি জানি তুমি আমার কাছে কী লুকোতে চাইছ। এটাও জানি দিলু কেমন করে মারা গেছে আর তাতে তোমার কতটা হাত ছিল। তাই হয় সবকিছু আমার কাছে সাফ সাফ কবুল করো না হলে, আল্লার দোহাই, অন্য পথ দেখো। দিলুর মা আর সেই সহিস ছোকরা এখানেই আছে। আজ রাতেই ওরা সদরে যাবে। দুজনেই শনাক্ত করবে লাশটা, আর একজন বলবে দিলুর লাশটা পোঁতার পিছনে কার হাত ছিল।

ছকু : শাহসাহেব, আস্তাবলের ছোঁড়াটাই দেখছি তোমার শেখ ফরিদ। আগের ঘটনা সে-ই তোমাকে জানিয়েছে। মিয়াজান, তুমি তো আমার কাছে বাচ্চা; দুনিয়াদারিতে আমরা কেউ কম যাই না, দুজনের দুজনকে চিনতেও কিছু বাকি নেই — তাই বলি কী, শেখ ফরিদের নামে ভাঁওতাবাজি বন্ধ করো, তোমার ওই সব ফকিরি চাল ফালতু লোকেদের দেখিও। আমি জানি কাঠের মামলাটা নিয়ে তুমি খাপ্পা হয়ে আছ। সেই সময় তুমি আমাকে কিছু দিয়েছিলে, এখন এই ঝামেলা থেকে আমাকে রেহাই দাও, আমিও

তোমাকে কিছু দেব। তাই বলছি এবার মুখোশ খুলে একটা সরাসরি বন্দোবস্ত হয়ে যাক। আমার বেশি সময় নেই, এখুনি আবার থানায় ফিরতে হবে। তোমার মদত পেতে কত দিতে হবে বলে ফ্যালো।

মিয়াজান : তোবা! তোবা! দারোগাসাহেব! আপনি কি আমাকে এখনো শয়তানের দোসর ভাবেন, যে টাকার কথা বলছেন? তখন যেসব কাজকর্ম করেছি তার জন্য এখন আমি আফশোস করি। খোদা জরুর আমায় এতদিনে মাপ করেছেন। আমি ফকির মানুষ, একটা পাকা সুন্দর মসজিদ বানাতে না পারলে, টাকা দিয়ে আমি কী করব? আমার বহুদিনের ইচ্ছে একটা মসজিদ তৈরি করি। আপনাকে দিয়ে যদি সেই কাজ হয় তাহলে আমার খোয়াইশ পুরো হবে। আর সেইসঙ্গে বোধহয় এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে আল্লা মাঝেমাঝে চান লোকসান হোক, যাতে তার থেকে ভালো কিছু বেরিয়ে আসে। দারোগাসাহেব, আপনাকেই হয়তো তিনি বেছে নিয়েছেন পির-ফকিরদের এই উপকারটা করার জন্য। আপনি এই পির-ফকিরদের দীন সেবককে যা দান করতে চান করবেন, আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

ছকু : ইয়া আল্লা! মিয়াজান, তুমি দেখছি খুব চালু। এই বয়সেই এত ফেরেব্বাজি! আমার তো দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেল, তোমার তো গোঁফের রেখাও ওঠেনি, তা-ও বলছি, তুমি হলে আমার ওস্তাদ, আমার গুরু, আমার পির, বুদ্ধির বিচারে তুমিই খোদ শেখ ফরিদ। এতক্ষণ যে গল্প আমায় শোনালে তার একটাই মানে — আরো বেশি টাকা। আল্লার নামে খোলসা করো কত চাই তোমার?

মিয়াজান : দারোগা সাহেব, পিরদের সেবককে আপনি যে কথা বললেন,

তার জন্য আল্লা আপনাকে রহম করুন। মতলব হাসিল হলে আপনি এক সময় দরগায় মিঠাই ভেট চড়াতেন। মসজিদ তৈরি করতে হাজার টাকাই অনেক। দিলুর মা-কেও কিছু দিতে হবে, ধরা যাক দুশো; ছেলের খুনের জন্য এটা খুব বেশি নয়। আর ধরুন সহিস ছোকরাটাকে গোটা পঞ্চাশেক দিতে হবে, সে তো আর লাশ পুঁতে ফেলার কথা বলতে যাচ্ছে না। আমার কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হয়, ফকিরের ধনদৌলতে কী কাজ?

ছকু : আল্লা! আল্লা! মিয়াজান, তোর কলজেটা কি পাথর দিয়ে তৈরি? এই বুড়োটার জন্য তোর কি এতটুকু দরদ নেই, তার মেহনতের কামাই তুই এইভাবে ছিনিয়ে নিতে চাস? হাজার টাকার মসজিদ, ওই দিয়ে তো হুগলির ইমামবাড়া হয়ে যাবে! ছেলের পড়তা বাবদ দিলুর মা-কে দুশো টাকা! কেন, ওই বজ্জাতটাকে তুই নিজে চিনতি না — আখেরে ওই হারামজাদার ফাঁসি হতই, তাতে পরিবারের বদনাম। ব্যাটাকে কোতল করায় ওর মা-র কোনো লোকসান হয়নি বরং ফয়দাই হয়েছে। খয়রাতি করতে আমি রাজি। লাশটা ছেলের বলে শনাক্ত না করলে ওকে আমি কুড়ি টাকা দেব। সহিসটাকে দেব পাঁচ টাকা, যদি বলে সেই রাতে আস্তাবলে সে ছিল না। আর মিয়াজান বাবা (পা জড়িয়ে ধরে) তোমাকে দেব দুশো টাকা। এখন আমার জান বাঁচাও!

মিয়াজান : কী দারোগাসাহেব, পিরদের ভেট চড়ানো কোথায় গেল?

ছকু : পিররা জাহান্নামে যাক। কবে কখন খুশি হয়ে মিঠাই বিলিয়েছি তার সঙ্গে কি এখনকার তুলনা চলে?

মিয়াজান : ঠান্ডা হোন, দারোগাসাহেব, আপনার বাজে কথা শোনার আমার ইচ্ছে নেই। ব্যবসার নজরে পুরো হাল বিচার করুন। ফাঁসিতে লটকানো ভালো, নাকি ১২৫০ টাকা লোকসান দিয়ে রেহাই

পাওয়া? আপনি আপনার ধনদৌলত নিয়ে কবরে ঢুকবেন না, আপনাকে সেসব রেখে যেতেই হবে। কোম্পানি বাহাদুরের ঘরে চলে যাবে সেই টাকা। দারোগাসাহেবের কোনো ওয়ারিশ আছে বলে তো শুনিনি, তাই যারা আপনাকে ফাঁসিতে লটকাবে তারাই আবার ভোগ করবে আপনার ধন-দৌলত।

ছকু : বজ্জাত ফিরিঙ্গি কাফের! আমার পয়সা আছে আর ওয়ারিশ নেই জানলে, এখুনি আমায় ফাঁসিতে লটকাবে। নবাব সামসুদ্দিনকে যেমন লটকেছে। তোর ফেরেব্বাজি জানতে আমার বাকি নেই। নিয়ত্ করা-টরা তো সব ভান। কিন্তু তুই মুসলমান, আমি দশ হাজার বার বলব, তুই ফেরেব্বাজ হলেও আমার দৌলত যেন তোর হাতে যায়, ওই বজ্জাত ফিরিঙ্গিদের হাতে নয়। মিয়াজান ভাই, তুই যা চাইবি আমি দেব। ইচ্ছে হলে তুই পিরদের জন্য দরগা তৈরি কর, নাহলে যা ইচ্ছে কর। আমি আমার হায়াত, আমার ইজ্জত তোর হাতে ছেড়ে দিলাম। তোর যা ঠিক মনে হবে তা-ই করবি। তবে ভুলে যাস না আমিও একজন মুসলমান। দিলুর কী করে মওত হল তা তুই শুনেছিস। আমি ওকে কোতল করিনি। মওতই ছিল ওর উচিত সাজা, আর সেটাই হয়েছে। মিয়াজান, ভুলে যাস না, তুই দারোগা থাকার সময়ে এর থেকেও অনেক খারাপ কাজ আমরা করেছি। তোকে পুরো মামলাটা বলছি শোন।

ছকু এরপর আমাকে সেদিন দিলুর সঙ্গে কী হয়েছিল তার হুবহু বয়ান দিল। এত খোলাখুলি কথা যে ছকুর মতো লোক বলতে পারে সেটা দেখে তো আমি তাজ্জব! আসলে ওর নিশ্চয় মনে হয়েছিল এখন আর আমার কাছে লুকোনোর কিছু নেই, বিশেষ করে যাকে ও এতগুলো টাকা কবুল করেছে। ওর মতো আহাম্মকই ভাবতে পারে, যে চোট মওকায় পেয়ে সে

দিয়েছিল তা আমি ভুলে যাব। ছকুর তখন এমনই হাবভাব যেন আমরা দুজনে একই থানার কর্মচারী। এতে আমি খুশিই হলাম, দিলুর কেমন করে মওত হয় তা নানাজনের মুখ থেকে আমি শুনেছিলাম, এবার ছকুর কাছে পেলাম তার খুঁটিনাটি। সে এখন আমার কবজায়। এমনই গেরো যে নড়াচড়ার উপায়টুকুও নেই। সে ফাঁসিতে ঝুলবে এই ভাবনায় আমি তখন মশগুল।

ছকু তার কথা শেষ করেই কোমরের গেঁজে থেকে একটা চামড়ার বটুয়া বের করল। সেখান থেকে গুনেগুনে আমার হাতে তুলে দিল ষাটখানা সোনার মোহর। বলল, প্রত্যেকটা একুশ টাকা করে হবে, ১২৫০ টাকার কিছু বেশি। বাকিটা দিয়ে আমি যেন তার খালাস হওয়ার দিন মিঠাই বিলি করি। এরপর ছকু খোশ মেজাজে রওনা দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি শুরু করলাম সদরে যাওয়ার তোড়জোড়। লাশটা শনাক্ত করার জন্য সঙ্গে চলল দিলুর মা আর সহিস ছোকরাটা। দর কষাকষির পর কত ঠিক হল সেকথা ওদের বলিনি। শুধু বললাম ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তারা যা জানে সব যেন খোলাখুলি বলে। আমি আখরি দিন পর্যন্ত তাদের পাশেই বন্ধুর মতো থাকব, আর এটাও খেয়াল রাখব যাতে ছকুর ফাঁসি বা কালাপানি হয়।

সেই রাতেই আমরা তিনজন রওনা হলাম। পরের দিন সকালে দিলুর মা আর সহিস ছোকরা লাশ শনাক্ত করল। সেইসঙ্গে আস্তাবলের ছেলেটা সাফসাফ জবানবন্দি দিল কীভাবে সেই রাতে লাশটাকে গোর দেওয়া হয়েছিল। ছকু ছাড়াও আরো দু-তিনজনের নামও সে করে। তদন্তের খবর শুনে ছকু তো তাজ্জব। বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢোকানো হল হাজতে। দায়রা আদালতে খুনের ফয়সলা যতক্ষণ না হচ্ছে ওকে ততদিন হাজতেই আটকে রাখা হবে।

কীভাবে দিলু খুন হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ এতদিন ছিল না। ময়নাতদন্তে বলা হয়েছিল কোনো জবরদস্তির কারণেই মওত হয়েছে; কিন্তু সেই জোরজবরদস্তির পিছনে কে ছিল সেটা জানা যায়নি। হাকিমের সামনে

তাই এইরকম ভয়ানক গুনাহ্গারকে খুঁজে বার করার একটাই রাস্তা খোলা ছিল : তিনি এলান করলেন আসল অপরাধী ছাড়া অন্য কেউ রাজসাক্ষী হলে তার অপরাধ মকুব করা হবে। এই কথা শুনে থানার যে দুই বরকন্দাজ ছকুর সঙ্গে মিলে দিলুর উপর জবরদস্তি চালিয়েছিল, তারা রাজসাক্ষী হয়ে গেল। তারা অপরাধ কবুল করায় দায়রা আদালতে ছকুর বিরুদ্ধে রুজু হল মামলা।

যেদিন দিলুর খুনের অপরাধে তেজপুর থানার অ্যাকটিং দারোগাকে আসামির কাঠগড়ায় তোলা হল সেইরকম খুশির সময় আমার জীবনে আর এসেছে কি না আমি মনে করতে পারি না।

ছকুর সুরত এতটা পালটে গিয়েছিল যে চেনা দায়। হাজতে কয়েকদিন থাকায় আর গাঁজার জোগান বন্ধ হওয়ায় ওকে দেখাচ্ছিল যেন একটা বুড়ো বেওয়াকুফ। বেপরোয়া হাবভাব সব গায়েব। আদালতে খুব কাছ থেকে দেখেও ও আমাকে চিনতে চাইল না। কোনো মজাই ছিল না এই বিচারে। ওর অপরাধের একেবারে পরিষ্কার প্রমাণ ছিল। ও যে বেকসুর সেকথা প্রমাণ করতে বারেবারেই বলতে লাগল, এসব হচ্ছে ওর দুশমনদের ফন্দি, যারা ওকে বরবাদ করতে চায়। ছকু কোনো সাক্ষীকে ডাকার কথা বলেনি। কারণ এই পাপের দুনিয়ায়, ওর মতো মা-বাপ-হারা গরিব লোক কোত্থেকে ইমানদার সাক্ষী ধরে আনবে, যে ওর হয়ে কথা বলতে চাইবে? খোদ জজসাহেব আর আল্লা ছাড়া ওর নাকি আর কেউ সাক্ষী নেই।

আসামি তরফের উকিল কিছু সওয়াল করতে চায় কি না জিজ্ঞেস করা হলে, সে শেষ চেষ্টা করেছিল নিজের মক্কেলকে আধপাগলা বলে চালানোর। এতে যদি আসামির সাজা কিছুটা মকুব হয়। 'পাগল' কথাটা সে বলেছে কি বলেনি, ছকু একেবারে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে শুরু করল, সে নিজে পাগল, কেবল টাকা নেওয়ার বেলায় খুব সেয়ানা, এর মধ্যেই সে তার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আর এখন আলিসান জজসাহেবের

সামনে খুলে-আম বলে বেড়াচ্ছে মক্কেল নাকি পাগল! ছকু আরো বলতে লাগল, 'দোহাই খোদাবন্দ মামুত, এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে আমার বিরুদ্ধে জালিয়াতি হচ্ছে?' ছকুর হাবভাব দেখে উকিল চুপ মেরে গেল, তারপর আর কথাটি না বলে জজসাহেবকে লম্বা সেলাম জানিয়ে বসে পড়ল। যতক্ষণ জজসাহেব রায় লিখলেন ততক্ষণ আদালতে কোনো আওয়াজ শোনা গেল না। লেখা শেষ হলে, উকিলরা দাঁড়িয়ে উঠল সেটা শোনার জন্য। ছকুকেও সামনে ঠেলে দেওয়া হল, যাতে সে ভালো করে সবটা শুনতে পায়। আদালতের রায় মোতাবেক ছকুর হল চোদ্দ বছর আর তার দুই শাগরেদের সাত বছর করে সাজা। সবটা ভালোমতো তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলে সে চিৎকার করতে লাগল, 'জান গয়া, জান গয়া!' তারপর চেষ্টা করল জজসাহেবের পায়ে পড়ার। তাঁর ইশারায় ছকুকে যখন আদালতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন আবার সে চিৎকার করে উঠল, 'আপিল করেগা, আপিল করেগা!' আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি হাত তুলেছি আশীর্বাদ করব বলে, যা ফকিরমাত্রই করবে, কিন্তু বদমাশটা করল কী, আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'থুঃ, কাফের।' সদরে আপিল করলেও ওর সাজা বহাল রইল। ওকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুর কয়েদখানায়, সেখানে বছর খানেকের বেশি সে বাঁচেনি।

থানার লোকেরা বলত, ছকু অনেক ধনদৌলত করেছিল; কিন্তু ওর সাজা হলে তার অল্পই পাওয়া যায়। থানার পুরনো মুহুরি নব চক্রবর্তীকেই সবাই সন্দেহ করেছিল। সে জানত ছকুর কোনো ওয়ারিশ নেই। তাই চোদ্দো বছর বাদে ছকু যদি ফিরে আসেও তার সম্পত্তির উপর কোম্পানি বাহাদুরের থেকে নবর হক যে বেশি একথা নিশ্চয় সে ভেবে নিয়েছিল।

আমার আর বেশি কিছু একরার করার নেই। জীবনের শেষ দিনগুলো আমি আল্লার নাম করেই কাটাচ্ছি। ছকুর টাকা দিয়ে মসজিদ আমি তৈরি করিনি, তবে মক্কায় ঘুরে এসেছি। সেখানেই আমি আরবিতে কোরান পড়তে শিখেছি। মক্কা থেকে ফিরে আসার পরে লোকে আমায় শেখ হাজিসাহেব

বলে ডাকে। তারা আমাকে এতটাই খাতির করে যে, দূর দূর থেকে চলে আসে তাদের শরীর আর মন শুধরাতে। কী করে ইলাজ করতে হয় আমি জানি না। লোকেরা শুনতে চায় না, জোর করে। আমি তাই কাগজের টুকরোতে কোরানের বয়াত লিখে পাকিয়ে বড়ির মতো করে ফেলি। তারপর তাদের বলি সেগুলো গিলতে। লোকেদের এই সরল বিশ্বাস কী চমৎকার, মজহাবের[১] নামে কত তাজ্জবই না ঘটে! এখানে যত কবিরাজ আর হেকিম আছে তাদের সবার থেকে অনেক বেশি অসুখ আমি এইভাবে ভালো করেছি। সেইসঙ্গে এটাও বুঝেছি যে আমার ওষুধে কারো খারাপ হবে না। অন্যদের কথা এত জোর দিয়ে বলা যায় না, আর বিলেতি ডাক্তারদের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

যে ছেলেটা ছকুর সহিসের কাজ করত তাকে আমি শাগরেদ করেছি, ও-ই হবে আমার ওয়ারিশ। দিলুর মা-কে দিয়েছি দরগা দেখভালের কাজ। রোজ সে দরগা সাফ করে, আর যা প্রসাদ ভেট আসে তার ভাগ পায়। আল্লা যদি তাকে লম্বা উমর দেন তাহলে সে নিশ্চয় বুঝতে পারবে তার জন্য ছকুর দেওয়া দুশো টাকার কী গতি হল। তার টাকা যে এইভাবে ফিরিয়ে দিতে পারছি সেটাতেই আমি খুশি। পড়তে পারি বলে জেনেছি যে, কোরানে বলা আছে সব থেকে বড় গুনাহ্ হচ্ছে ধার রেখে মারা যাওয়া। আমার ইচ্ছে, যদ্দিন আমি জিন্দা থাকব এইসব কথা তুমি কাউকে বলবে না। বলবে না বলে শপথ করেছিলে বলেই আমি একরার করেছি। এইভাবেই আমি আমাদের দোস্তির প্রমাণ রেখে গেলাম।

১. ধর্ম

প রি শি ষ্ট

১. বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ

F.F.Christian - the Confession of Meajahn, Daroga of Police, dictated by him, and translated by a Moffussilite
Copyrightholder : Not stated
Printer : Calcutta Central Press, 5 Council House Street, Calcutta
Publisher : Messers Wyman and Company, 1A Hare Street, Calcutta
Edition : First
Date of publication : 10.4.1869
Pages : 148
Number of copies printed : 200
Size : Demy 8vo.
Price : Rs. 3-0-0
Comments : -----------
(Slr No1701, in the Second Quarter for 1869, in Bengal Library Catalogue.)

২. ক্যালকাটা রিভিয়্যু

Calcutta Review

1869 vol : 49 No. 98 Critical Notes

The Confession of Meajahn, Daroga of Police, dictated by him, and translated by a Moffussilite, Calcutta, Wyman & Co. 1869

This little book which purports to be a truthful narrative of events which took place not more than thirty years ago, reads more like a romance at the present day. Such is the remarkable change which has come over Bengal during that short period. " The Confessions of a Darogah" relate to a period when the promotion of native subordinates depended upon the charms of their female relatives,when the value of an office was estimated rather by the opportunities for taking bribes than by the amount of salary attached to it and when for these and other reasons the law was not strong enough to protect either Native or European. Hence it was that almost every planter found himself thrown back upon his own defence and at times was even compelled to act on the aggressive. Meajahn's confessions are mainly occupied with the history of such affrays between the planters and zemindars, the former being personated by one Mr.Black,who is describe as being in a constant state of feud with one Pretab Gangooly. The account of the skirmishes between these two parties and of various

plots and strategies which each employs against the other would be interesting even if it were wholly fictitious, but bearing as it does evident marks of truth, its interest becomes absorbing,and we are lost in amazement at the reflection that so exciting a picture of lawlessness should have been possible so short a time ago." These Confessions" writes the author in his preface, "will serve to show to the New police and the new school of civilians how different were the official surroundings of their predecessors thirty years ago. In this transition period of Indian history,thirty years mark as great a space of time as a century in other countries, and before the incidents of the mofussil life of those days are utterly forgotten, the writer has noted down his recollections in the hope that they may prove interesting to the old generation of planters and officials now rapidly passing away, and the new generation that has taken its place."

Such relations as these, moreover, are not only interesting as affording an illustration of social life in Bengal some years back, but also as evidencing the progress of law and order under the British rule. Indigo disputes, if not yet altogether unknown, are never the less comparatively rare. Increased salaries have given a considerable check to dishonesty amongst native subordinates, while the improved administration of our courts has diminished the opportunities for bribery. A higher moral tone pervades the whole of the English Community, and such objectionable connections as that which led to the elevation of Meajahn, are happily discountenanced in the present day. It is at any rate gratifying to think that in these matters British rule has not been a curse to the people; that we have not abused our trust , but are

sincerely striving to correct irregularities amongst ourselves as well as amongst the natives. In this manner we are taking the surest steps to consolidate our power and to make our supremacy tolerable, if not acceptable, to the people at large. *(pp.235-236)*

৩. দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট

The Hindoo Patriot

(June 7, 1869. 2 page review pp 181-182)

THE BENGAL POLICE THIRTY YEARS AGO- No other English institution is so terribly associated in the minds of the people of this country as the police. Indeed the oppressions committed by the police were so great and appalling that the people in the Mofussil oftener put up with the loss of property or injury to person than called in the aid of the appointed guardians of the peace. Considerable light has been thrown on the doings of the Bengal Police thirty years ago by the publication of a brochure by Messer's Wyman and Co., entitled "the Confessions of Meajan, Darogah of Police, dictated by him, and translated by a Mofussilite." We are informed that "truth has guided the pen of the writer, and the characters in his history have been taken from. real life."For the sake of the Bengal Police and Civilians, and of humanity at large, we fear there is much truth at the bottom. Our author says that in course of travels through lower Bengal, it was his good fortune to become acquainted with a man in the prime of life, who lived in a Mussulman temple as a Fakeer.He cultivated this man's acquaintance, and they became fast friends owing to his having cured him of temporary deafness by application of a galvanic battery. The fakeer gratified our author's curiosity by relating the incidents of his chequered life, on a promise that he would

not make them public during his life-time. As the man is now dead, our author has given them to the world.

Meajan, whose biography our author relates, was a peasant boy by birth. He was fortunate enough to have possessed a young and beautiful sister, whom the knave of an orderly of a collector, a man who if anything was older than the girl's father had married. This orderly, who is called Fakeer, ingratiated himself in his master's favor by lending his wife, was a great pet of the Huzoor, and had as a matter of course unbounded influence. He sent for his brother-in-law, the subject of this sketch, then a lad of about fourteen years, and got him a by no means unimportant post of peon on Rs.4 per month. We say "not unimportant" advisedly, for hear what Meajan says: "My sister continuing to be the favorite begum of the collector sahib, my rise became rapid. Although my sister's position was supposed to be a profound secret, it was only the secret of the comedy; everybody knew it as well as I did myself, but all pretended ignorance. People of all classes courted me; presents in money flowed in upon me from all quarters."

The turning –point in Meajan's fortune was the occurrence of a dacoity in one of the neighbouring villages. As the Darogah had failed to discover the culprits, Fakeer proposed to exert his influence for getting the appointment for his brother-in-law, if he would summon courage to undertake the venture of finding out the perpetrators. Meajan had not then been hardened in the ways of Police life and was rather timorous. But Fakeer let him into the mysteries of success in Police business in the following manner:

Meajan — "How do you want me to go about this business;

can I discover the stolen property or catch the dacoits?"

Fakeer — "Of course you can. Listen: Kartick Podar, in whose house the dacoity was committed, is as timid as he is rich; he knows who the dacoits are, but he won't name them; he knows where the stolen property is, but he won't tell, because the dacoits are protected by the Bannerjees, his talookdars, and the *mal* is most probably in their house; but let that pass it is neither your business nor mine. But you know Ram Chand Gangooly he has a terrible grudge against his cousin Pretab. If you can bring the dacoity home to Pretab as a receiver, your fortune is made."

Meajan — "But how can I do that?"

Fakeer — "The easiest thing in the world. To-morrow morning, just before the collector sahib leaves the breakfast-table to go to the cutcherry, you and Sonawallah will talk over this dacoity while you are sitting in the verandah behind the sahib, in whispers, but sufficiently audible for the collector to overhear part of your conversation. You must say that it is extraordinary that, this dacoity should remain as it is: the darogah of thannah T. is a bad man, and so on, and leave the rest to me."

Meajan — "What next?"

Fakeer — "I know the collector. When he is alone he will send for me and question me about your morning's conversation. I will tell him that I am certain you could find out the stolen property of this dacoity, if he gave you a letter to the magistrate sahib, and if the magistrate

sahib sent you to the T. thannah as an acting darogah, with the promise of confirming in the appointment if you succeeded in discovering the dacoits and the stolen property."

Meajan — "Well, and suppose I am sent to the thannah as acting darogah, how can I discover the dacoits or the property? I cannot read nor write."

Fakeer — "You can sign your name; that is quite enough for a darogah; Ram Chand Gangooly will do the rest. Before leaving the station to join the thannah, you will receive Rs. 200 and Rs. 300 more if you can have Pretab convicted, and after that you will become the pacca darogah of thannah Tezpore, and become a rich man in two years."

Meajan — "But how can I have Pretab made a dacoit of, and find the property?"

Fakeer — "In this way: as soon as you arrive at the thannah, you must take a strong force of burkandazes, chowkeydars, and goindahs, and march off to Kartick Podar's house. This of itself is worth Rs. 100 to you. This is the usual nuzzur on a darogah's arrival at a rich man's house on an occasion of this kind. You will, of course, take the nuzzur through your bucksy, and for decency's sake wit for half an hour, and smoking and cooling yourself before proceeding to have Kartick taken up and securely tied with his hands behind his neck. He is then to be taken to an out-house; a long rope, passed over a bamboo that serves as rafter, must be fixed to the end of the rope with which Kartick Podar's hands are to be tied together, and hauled. You

will now easily see that Kartick's position becomes very curious, not to say unpleasant. By hauling him up to the rafter, with his hands thus tied, the whole weight of his body falls on his twisted shoulder blades; if you went on hauling, until you lifted him up, you dislocate both his shoulders. In all my experience I only knew one man who could pass through this ordeal without coming to terms. In Kartick's case it won't be necessary to give more than one gentle haul; he is fat and heavy, and his arms are weak and the joints small, besides he is a Tamoolee by caste. These men are easy to deal with; they never give trouble. Do you now see your game?"

Meajan — "Yes! I see that we have got Kartick in our power, and I think I can guess the rest."

Fakeer — "Ah! You are the true son of Amiran. Your father is a fool, but you have more of your mother in you. Kartick, now having become manageable, discloses that he recognized among the dacoits Bholah Sirdar and Tiluck, the two retainers of Baboo Pretab Gangooly, and as Pretab Gangooly is a notorious rioter and bad character, he suspects him to have in his house the property which he has lost by dacoity. You issue a search warrant; the house is searched, the property found, and the rest becomes plain sailing."

Meajan — "But will the property be identified by Kartick?"

Fakeer — "Of course it will, or why the rope and rafter and the rest of it?"

And Meajan followed the instructions to the letter. We have neither time nor space to describe in detail as to how

Meajan with a comrade Sonawalla contrived to converse in audible whisper about the dacoity when the Collector passed by them, which drew his attention, how when the shaheb was alone and was smoking his cigar in his verandah in the cool evening air Fakeer managed to introduce him to the shaheb and got a letter of recommendation to the Magistrate, how the Magistrate's "Fakeer", for every European as author aptly observes has his "Fakeer", was bought over, and the amla of the Magistrate's Court influenced, and how these diplomatic maneuvers resulted in success. Suffice it to say that Meajan got the usual letter of appointment and took charge of the Thanna assigned to him. Our author thus describes his hero's arrival at the Thanna:

"I got out of the palkee; a chair with only one arm was brought for me, and dusted and wiped by four or five persons at the same time. I sat down endeavouring to imitate the manner of a sahib, and with a thrill of intense pleasure heard myself, for the first time in my life, addressed as huzoor by people standing before me with their hands joined.Chowkeydars were dispatched in a hurry in all directions to look out for milk, fowls, kids and fish for the darogah sahib. One of the hangers-on of the thannah, who had an old grudge against a bostomee living hard by, suggested the expediency of bringing a fine goat that she had for he darogah sahib; another remarking that she would not like to give it, one of my followers rose indignantly and told the chowkeydar to go and bring the said goat at once, and if the bostomee made the least objection, to ask her if she meant to obey the Company's hokum or not. With *jo hokum bunday nayage*, the chowkeydar started off, and I saw him returning a short while after, dragging a large

white goat, with a cloth tied round the neck, and a stout, good-looking young woman running after him crying, and every now and then throwing herself at his feet. I pretended not to see this, and the woman was finally driven off, on the chowkeydar's nearer approach to the thannah, by one or two others running up to him, with the evident intention of ill-treating the bostomee; guessing at their intention, she beat a timely retreat. During the remainder of the evening, chowkeydars came in from all quarters, some with fowls, ducks, kids, milk, but none with fish: it was too late in the day to catch fish, and even the Company ka hokum had not the power to make fishermen go into cold water on a February evening. I looked with delight on the presents that were brought; they were the first-fruits of the hard cash that I had laid out to procure my berth, but, considered from a business point of view, they had not the same value in my eyes as they had appeared to have when first brought in."

Our young Daroga was panting after hard cash as he wanted to recoup himself the money he had laid out for getting his post. He had made a happy hit. There were 1200 mouzas within his Thanna jurisdiction, and he held a levee, which brought him a nuzzur of Rs.1200 at the rate of a rupee a mouza. This was only the foretaste of what was to come. He says:

"It is not to be supposed that the nuzzur from the chowkeydars is the only perquisite of the new darogah. It is no doubt the largest that comes in in a lump sum, but there are others which,though they do not come in a torrent like the first, still follow in a continuous stream, slow and dribbling in appearance, but which none but a darogah can tell to what a handsome sum they amount at the end of the year. I had not

yet seen the different thannah. I had my bargains yet to make with them. It was the custom for the indigo-planters to give so much a year to the darogah of their district; the usual neerick I understood to be at the rate of about four annas per maund on the yearly out turn of the concern; that is to say , a thousand maund concern would be expected to give Rs.250 annually to the darogah. This was the tradition only however,for in actual practice it had been greatly reduced, as I found the largest concern did not pay more than Rs.150 annually, and some as little as Rs. 50, and the native zemindars gave certain fixed sums at the commencement of the Doorga Poojah holidays, ranging from Rs.100 to Rs.200. My income from all these sources did not average more than a thousand rupees a year. These sums were given on the understanding that no other bribes in detail were to be given to the darogah on the occurrence of any cases in which the doners or their people were concerned, of which the darogah had the investigation; but,practically, this system was not found to pay, as on the occurrence of any case, in which these parties were concerned, the darogah himself did not care to go, as he had nothing to except his *coraky* of one rupee per day. He would generally depute the bucksy or jemadar, and these not being included in the payment made to the darogah, new arrangements had to be made with them on *hard cash* terms, which had to be paid , or else the case in hand was ruined. These things became so much the rule, that many planters would now and again demur to the annual payments, but they were met with the insurmountable objection that these payments had always made, and that it would be making a mortal enemy of the darogah to stop them, and so they were continued."

We now come to the Dacoity in Kartick Podar's house. The Darogah proceeded in state to this man's residence, but his gomastah put in an excuse that his master was not at home. He was immediately arrested, and Rs100 was the price of his release. The master who was reported to have retired to the Hoogly to bathe turned up in the evening.He was subjected to most excruciating torture to get his confession that "Pretab Gangooly" was at the bottom of the Dacoity in his house. This Kartick would not confess. Let our hero describe the torture to which this poor fellow was subjected:

"Kartick was brought in. and to begin with a space,three cubits and a half in length,was measured out with exactness on the floor by one of the burkundazes,in the most businesslike manner; the two extremities of the space were carefully marked,and Kartick was civilly requested to stand up with his legs stretched out, each as far as one of the extremities, like a pair of compasses opened out. This request was more easily made than complied with.Kartick was barely five feet in height, with a long bust and short legs, and a large protruding stomach inclining downwards. He looked at the space between the two marks on the floor, and , stuttering with consternation, desired to know what they wanted him to do to escape the performance of the terrible feat before him. Chuckoo then said,"Why not confess that Pretab Gangooly's men. Teeluck and Bholah, were the dacoits who committed the dacoity in your house, and that you believed the property would be found in Pretab's house if a search were made." At this suggestion,Kartick burst out, spluttering and crying, declaring that if he did so,Pretab would murder him and all his family. "Have mercy,jemadar sahib! You know Pretab Baboo. Can a man like me accuse him?

He made the superintendent of police, Dampier sahib, drink buttermilk. He will bury live in one grave all my family."

"Very well, stretch out," said Chuckoo; and Kartick was made to stand over the fatal space,with the burkundaze at his legs , trying to draw them asunder. There was nearly a foot yet to spare of the distance between the two extremities, and Kartick was already running over in a cold perspiration at his efforts to reach the two ends with his short legs, and was in imminent danger of being split into two, when , trembling and tottering, he fell back senseless."

Kartick never woke to life again.But the Daroga aided by his astute jemadar easily hushed up this matter. He reported that Kartick Poddar had the evening before come to the thannah, in apparently excellent health,for the purpose of making a statement on the subject of a recent dacoity committed in his house , and that he had suddenly fallen into a fit and expired in the presence of himself, the jemadar,and two of the burkundazes,whose names were mentioned in the report; that there were not the least grounds for doubt about the manner of his death, and the corpse was sent to the huzoor for inspection. A private message to Fakeer did the rest, who was asked to look to the native doctor, who it was hinted might not be too particular in examining the dead body. The dodge succeeded, and the Magistrate was satisfied that "Kartick had died of disease of the heart." This is the way things were or are managed in the Moffussill.

Let us take a peep into the character of Pretab Gangooly, mentioned above. Our author says: "Pretab had grown up neglected in education, and did not even know how to read and write; and having been brought up in a wild and lawless

country, surrounded by lattials and men of bad character, had become like them in disposition, and supported by his cut-throat gangs, became the terror of the country, and set all law and authority at defiance. His village, Sreerampore, was the refuge of all jail birds of the country- men flying from justice, and lattials who had been proclaimed offenders, found shelter and security in his village; all, no matter what their crime or fault, found safety and protection on entering Sreerampore.

"The police had never yet been able to make a single capture within the precincts of the village. Many an attempt had been made, but those who tried them had come to grief."On one occasion, Mr. Dampier, the Superintendent of police, had sent twenty five of his nuzeebs, with loaded muskets, to assist the Magistrate in capturing Chunder Dutt. But the nuzeebs returned crestfallen; they had been disarmed and kicked out, and their muskets had been taken from them. It was this circumstance Kartick alluded when he said that Pretab had made the Superintendent of police drink buttermilk. He had a powerful rival in a planter called Mr. Black and no deed was sufficiently black in his eye. Conscience he had none, and with the resources of European education he was more than a match for the brave Bengalee. Lattialism was in those days an institution of the land , and many a pitched battle between two or three hundred armed men on either side were often fought, with the Magistrate as a spectator. Here is a description of the lattial fights:

"The enmity between Mr. Black and Pretab was intense. There was no mercy shown to the adherents of one when he fell into the hands of the other. Whenever there was an encounter between them, at the commencement Pretab's men

invariably carried the day. Mr.Black's fighting men were up-country burkundazes, and Pretab's were Bengalees. The first fought well when attacked in their entrenchments in a factory or cutcherry in defending themselves, but in the open field they were no match for the Bengalee *soorkywallahs*. These were, many of them, miserable objects in appearance, and could stand no comparison with the larger and finer men of Mr.Black. But they were thin , light, and active, and admirable workmen with their bamboo rods, with a small spearhead at the end, called a *soorky*. Of these they carried five or six each, one held in the right hand ready for use, either to be thrown at the foe from a distance of forty or fifty feet, or to stab him with it at close quarters. The rest of the *soorkies* were clutched in the left hand in a bunch, under or across the shield held in the same hand. These shields were made of the common rattan, and covered with raw cow hide. They offered complete protection against a cut with a sword, a dig with a *soorky* , or even against a charge of shot from a fowling piece, but none from a bullet, which went through them easily. Whenever a row took place in the open field, Pretab's soorkywallahs were victors, and Mr. Black's up-country men would return home roughly handled, with soorky wounds on different parts of the body, but chiefly about the thighs, legs, and arms – it being an accepted rule among soorkywallahs that no wound should be given in any vital part except at the last extremity. But this rule can only be adhered to when jobbing at close quarters, and cannot be so strictly followed when soorkies are thrown at each other from a distance. It consequently happened that , after every soorky fight, there were some ugly wounds about the chest and stomach, which very often proved fatal,from internal bleeding, the hole made by the soorky closing

up as soon as made. Black's up-country men would often return with such wounds, and, in spite of the surgical skill of their master, would mostly die.

Mr.Black had been in the army in his younger days, and bethought himself of drilling his burkundazes, and arming them with muskets. He set to work, and in a short time had a little regiment of fine strapping fellows, with red turbans, all armed with muskets, which Mr.Black's Calcutta agents had sent up to him. The tables were now completely turned upon Pretab. Whenever there was a fight, his soorkywallahs had no chance against Mr. Black's infantry, which fired with No.2 shot, called by Mr.Black his charges of grape. The shields warded off many of the shots, no doubt, but muskets charged with shot scatter fearfully, and as the shields were not more than a foot and a half in diameter, they could not cover the entire person. Every discharge of musketry scattered Pretab's followers like a flock of sheep: they had no chance, in spite of their crouching to the ground on coming within range of the muskets, and covering themselves with the shields; they could not hold their own any longer."

Our hero says:

"They were both great men, each in his way. There was, however, this extraordinary difference between them, that Pretab had more the stubborn pluck of the European, and Mr.Black more of the craft attributed to the Bengalee. I am a native, and ought to know the character of my countrymen; and having been a darogah, I have seen a good deal of the Europeans also – I mean of the European indigo –planters. When they have been in the country, specially in a troublesome district, fighting and quarrelling with the native zemindars,

they become far superior to them in most of the qualities required for holding their own against all comers. They get up a criminal case better than a Bengalee; they have more pluck also, not being disheartened and paralyzed with the loss of a case, as most natives are. They cannot come up to the natives in forgery alone. This is the native's battle field, and on it they are unconquerable. They have old stamp papers kept in store, in their families, for every possible contingency. Gomastahs, naibs, and other responsible servants,on accepting service with indigo-planters or zemindars, will frequently buy stamp papers, soon after taking service, endorsed in the names of their masters, for the purpose of forging receipts and discharges,pottahs or kuboolyuts, as the exigencies of the case may hereafter require, when they happen to fall out with their employers, as they mostly do, sometime or other."

Mr. Black was everything by turns. He was a sporting character to a sporting Magistrate, a hospitable man to all, and a pious person to the church going judge. In this way he acquired great influence with the Hakims and kept his enemies at bay.

But enough. The state of things described in the brochure before us may have been exaggerated here and there, but from our knowledge of the past of the Mofussil we can state that the substratum is one of truth and nothing but truth. The "Confessions" of Meajan afford another proof of the truth of Swedish minister's remark (*Brittle*) wit (*Brittle*)wisdom is the world governed. We (*Brittle*)success with which the British adm (*Brittle*) the face of this country (*Brittle*).confessions" of Meajan unfold! May we hope that the pictures depicted in these confessions have vanished altogether.